Cadence

ANNUAL MAGAZINE

2019

Bangladesh University of Professionals (BUP)

বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন - ২০১৯

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

প্রকাশকাল	:	ডিসেম্বর ২০১৯
বিইউপি বার্ষিক প্রকাশনা	:	দ্বিতীয়
প্রকাশক	:	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা	:	মেজর জেনারেল মোঃ এমদাদ উল বারী এনডিসি, পিএসসি, টিই
প্রকাশনায়	:	পাবলিক রিলেশন, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, বিইউপি । Phone : +৮৮-০২-৮০০০৪৭১, Fax : +৮৮-০২-৮০০০৪৪৩ E-mail : info@bup.edu.bd, www.bup.edu.bd
আলোকচিত্র	:	মোঃ ওসমান গনি সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা
প্রচ্ছদ	:	মেজবাহুল ইসলাম অসীম ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন মার্কেটিং আইডি নং- ১৬২৫১০৪৭
গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা	:	মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন
মুদ্রণ	:	রাইয়্যান প্রিন্টার্স ৩৩৭ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০ ফোন : ০১৯১৫৮৮৩৩৩৫ ওয়েব : raiyanprinters.com

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মেজর জেনারেল মোঃ এমদাদ উল বারী, এনডিসি, পিএসসি, টিই

উপদেষ্টা
প্রফেসর এম আবুল কাশেম মজুমদার, পিএইচডি

প্রধান সমন্বয়কারী
এয়ার কমডোর মোঃ আমিনুল ইসলাম, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জিডি(পি)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক
গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ সাইফুল ইসলাম, ইঞ্জিঃ

সদস্য
লে: কর্নেল সিরাজ উদ্দিন আহমেদ (অব:)
পিএসসি

সদস্য
ইঃ কমান্ডার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান
পিএসসি, বিএন

সদস্য
সহযোগী অধ্যাপক
ড. ফাহমিদা হক

সদস্য
সহযোগী অধ্যাপক
ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন

সদস্য
অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মোহাম্মদ শওকত ওসমান

সদস্য
অতিরিক্ত পরিচালক
মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

সদস্য
শাখা কর্মকর্তা
মাহ্‌মুদা আক্তার

সদস্য
শাখা কর্মকর্তা
মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ

বাণী

উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

সমসাময়িক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান ও উন্নত গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ২০০৮ সালের ৫ই জুন আত্মপ্রকাশ করে। মানসম্মত উচ্চশিক্ষা ও উচ্চমানের গবেষণার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার পাশাপাশি বিইউপি এ দেশের জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসহ বাঙালি জাতি, এর গৌরবোজ্জল ইতিহাস ও অনবদ্য বীরত্বগাথা সংরক্ষণ করতে বদ্ধপরিকর। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ঘুমিয়ে থাকা শক্তি সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত করতে গতবছর ডিসেম্বর মাসে Cadence এর ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশনার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা তথা সহশিক্ষা পাঠ কার্যক্রমের প্রতি তাদের আগ্রহ নিঃসন্দেহে একটি সৃজনশীল প্রতিভার সৃষ্টি করেছে। আর এ দুয়ের সমন্বয়ে তারা গড়ে উঠবে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে।

বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন Cadence শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তি ও সম্ভাবনার স্ফুরণ ঘটিয়ে মননশীলতার এক নান্দনিক দলিল হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়বারের মত ম্যাগাজিনটি প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সত্যিই আনন্দিত যে, এবারের ম্যাগাজিনটিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা পূর্বের মত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের অবদান রেখেছেন। এজন্য আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবারের সংখ্যায় স্থান পেয়েছে গল্প, কবিতা, ছড়া, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনী, বিজ্ঞান ও শিক্ষামূলক রচনা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখাসমূহ। শব্দের ছন্দময় দোলা "Cadence" প্রকাশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত দায়িত্ব ও মূল্যবোধ জাগ্রত করবে বলে আমি আশাবাদী।

পরিশেষে ম্যাগাজিনটি প্রকাশনায় যাদের অক্লান্ত শ্রম ও নিষ্ঠা জড়িত তাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। আমি একান্তভাবে এ ম্যাগাজিনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মেজর জেনারেল মোঃ এমদাদ উল বারী, এনডিসি, পিএসসি, টিই

বাণী

উপ-উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

অপর সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় আমাদের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)ও শিক্ষার্থীদের একাডেমিক দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সৃজনশীল কাজের দক্ষতা বাড়াতেও সদা সচেষ্ট। এই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'ক্যাডেন্স' নামক একটি ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের সহমত ও মেধার বিকাশ সাধনের নিমিত্তে এবং তাদের সৃষ্টিশীলতাকে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে এই ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করার উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

২০০৮ সালে যাত্রা শুরু করে বিইউপি আজ বাংলাদেশের এক মহীরূহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে এর কলেবর শুরু হলেও বর্তমানে এর পরিধি অনেক বিস্তৃত। এখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায়, যা একটি সহজাত প্রবৃত্তি। দ্বিতীয়বারের মতো প্রকাশিত এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের এ সহজাত প্রবৃত্তি বিকশিত হবে বলে আমি মনে করি। আর এ ম্যাগাজিনকে ঘিরে সংশ্লিষ্টদের মাঝে তীব্র উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত ও অভিভূত।

শিক্ষার্থীদের মানসিক ও বুদ্ধি-বৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে-'অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্ব মানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করে তোলা সাহিত্যের কাজ'। ম্যাগাজিনটি এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সৃজনশীলতা প্রকাশের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। ম্যাগাজিনের বিভিন্ন লেখনিসমূহ যেমন গল্প, কবিতা, ছোট গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, বিজ্ঞান বিষয়ক, রম্যরচনা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে মননশীল ও আধুনিক চিন্তামনস্ক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমি এ ম্যাগাজিনের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি। সামনের দিনগুলোতে এই প্রতিষ্ঠান তার সৃজনশীল কর্মযজ্ঞ আরও বাড়াতে সক্ষম হবে বলে আশা করছি। খোদা হাফেজ।

প্রফেসর এম আবুল কাশেম মজুমদার, পিএইচ.ডি

সম্পাদকীয়

প্রধান সম্পাদক
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা ।

নিয়মিত সাহিত্য চর্চা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের যথোপযোগী মাধ্যম। সাহিত্য চর্চা মানব মনের ভাবগুলোকে প্রস্ফুটিত করে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লালনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অনুরূপভাবে শিক্ষা মানুষের চেতনাশক্তিকে শাণিত করে, ন্যায়-অন্যায় বোধকে জাগ্রত করে। কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দ্বারা এই বিষয়গুলো অর্জন করা সম্ভব হয় না। সৃজনশীল লেখনী মননবিকাশের একটি অতি জরুরী উপাদান যা সহপাঠ্যক্রম হিসেবে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে সহায়ক। সেই সহপাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে বিইউপির বার্ষিক ম্যাগাজিন 'Cadence' নিয়মিত প্রকাশিত হওয়া সত্যিই এক আনন্দের ব্যাপার এবং প্রশংসার দাবিদার।

আমাদের শিক্ষার্থীদের আনন্দ ও উৎসাহের অভিব্যক্তি এই ম্যাগাজিন 'Cadence'। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের লেখনীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে শিক্ষা ও সাহিত্যের এই প্রাণাধার। যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী ও রম্যরচনাসহ আরও অনেক কিছু। এ প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের চিন্তাচেতনা ও অনুভূতি প্রকাশের একটি সুন্দর মাধ্যম, যার দ্বারা তারা সৃষ্টিশীল প্রতিভার বিকাশ ও প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করতে পারে।

মাননীয় উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য মহোদয় তাঁদের মূল্যবান বাণী প্রদান করে এ ম্যাগাজিনকে করেছেন সমৃদ্ধ। আমি সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। এছাড়াও সম্মানিত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থী যাদের লেখনী দ্বারা বিইউপির ম্যাগাজিন 'Cadence-2019' পূর্ণতা লাভ করেছে তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সম্পাদনা পর্ষদের প্রতিটি সদস্যকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। এছাড়া যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ম্যাগাজিনটি প্রকাশনায় সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বিইউপি ম্যাগাজিন শিক্ষার্থীদের সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করবে ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিবে এবং পাঠকের হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ দিবে এই আমাদের প্রত্যাশা।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ সাইফুল ইসলাম, ইঞ্জিঃ

সূচিপত্র
বিইউপি ম্যাগাজিন-২০১৯

ক্র/নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০১	Leadership and Values in the Contemporary World	Dr. Syed Anwar Husain	০১-০৩
০২	মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের বিদেশি বন্ধুরা	আবদুর রহমান রাহাদ	০৪-০৬
০৩	আমার গ্রাম	তাহমিনা সুলতানা	০৭
০৪	হেমন্তের শেষ শিউলী	মোঃ রুহুল কুদ্দুস	০৮-০৯
০৫	Greatness lies in nowhere	Rafia Atkia Rafa	১০
০৬	আকস্মিক	রিয়াদ হুসাইন	১১-১২
০৭	ব্যাপ্তিকাল	আব্দুল্লাহ আর রাকিব	১৩
০৮	August Night Raiders	Zulker Nayen Mahmud	১৪-১৫
০৯	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: সহজ সরল আলোচনা	ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	১৬-১৭
১০	Northern Light	Md. Arif Jawad Fahim	১৮-১৯
১১	বৃষ্টি	মোছাঃ শরীফা ইয়াসমিন	২০
১২	স্বপ্নের অপমৃত্যু : আমাদের করণীয়	আফরিন সাদিয়া রুমানা	২১-২২
১৩	সংগ্রাম হতে স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়	মেজর তানভীর হোসেন, পিএসসি	২৩-২৫
১৪	In search of light	Ridwana Islam Ruhama	২৬
১৫	আমার বই পড়ার গল্প	নাঈমুম সাকিব	২৭-২৮
১৬	অবিনশ্বর	সৈয়দ খালিদ আসফাক রুমি	২৯
১৭	প্রিয়তমেষু : বই	সাবাহ মেহজাবিন সরওয়ার	৩০-৩১
১৮	Military in Higher Education	Md. Quamruzzaman	৩২-৩৩
১৯	আকাঙ্ক্ষিত বাংলা	সাদিক হাসান	৩৪-৩৬
২০	ভালো থেকো সভ্যতা	মেজর সাব্বির আহমেদ (অব:)	৩৭
২১	A Flutter of Fairies	Tasnim Rahman	৩৮-৩৯
২২	আলেয়া	সামিরা তাসনিম অপরাজিতা	৪০-৪১
২৩	দেবী	মোঃ নাজমুস সাকিব	৪২
২৪	Euphoria and It's Forms	Anika Meher Amin	৪৩-৪৪
২৫	সমাজিকীকরণের গোড়ায় গলদ	সুপ্রভ চৌধুরী নিপু	৪৫-৪৬

সূচিপত্র
বিইউপি ম্যাগাজিন-২০১৯

ক্র/নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
২৬	মন-চোর	সাদিক আহামেদ সামি	৪৭
২৭	পালকের এপাশ ওপাশ	সামিহা কামাল	৪৮-৪৯
২৮	The Blazing Monster Dwelling in Dhaka City	Srabonti Habib Proma	৫০
২৯	ভালোবাসা ও নারী	আলমগীর খোরশেদ	৫১-৫৩
৩০	একটু প্রশান্তির খোঁজে	রফিকুল ইসলাম	৫৪
৩১	আকাঙ্ক্ষার প্রয়াণ	ফাহ্মিন চৌধুরী তাজিম	৫৫-৫৬
৩২	God	Md. Rakib Hasan Rabbi	৫৭
৩৩	আফ্রিকার সিংহ রুয়ান্ডা বনাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশ	মেজর এরশাদ মনসুর, ইবি	৫৮-৬০
৩৪	নীল অপরাজিতা এবং বৃষ্টি	আমিনা রহমান দৃষ্টি	৬১
৩৫	The Mustard Umbrela	Tasnim Naz	৬২-৬৩
৩৬	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যের রূপরেখা	আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী (তমাল)	৬৪-৬৭
৩৭	Call for Green and Blue Skies	Zuyairia Moslemeen Khan	৬৮-৭১
৩৮	A Pathetic Soul	Azmir Hossain	৭২
৩৯	শিশুর সুন্দর জীবন গঠনে পারিবারিক সান্নিধ্য	তোফায়েল আহমেদ	৭৩-৭৫
৪০	Dust Bin Free Dhaka City – Establishment of Circulatory Dust Van	Rashedul Islam Chowdhury, Md. Rakib Hasan	৭৬
৪১	মরা নদী	মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ	৭৭
৪২	সুন্দর পথ	সাজিয়া রহমান	৭৮
৪৩	Dengue and Recent Mosquito-borne Viral Fever Outbreak in Bangladesh: Concern, Causes and Control	Shazeed-Ul-Karim	৭৯-৮২
৪৪	পথিক	মোঃ নাছির উদ্দিন	৮৩
৪৫	বাংলাদেশে আইনগত সহায়তা	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	৮৪-৮৬
৪৬	আলোকচিত্রে বিইউপি	-	৮৭

Leadership and Values in the Contemporary World

Dr. Syed Anwar Husain
Bangabandhu Chair Professor

Etymologically, a leader is a person who leads. He leads followers. Followers accept a leader only when they find him articulating and representing their interests; and they even find that their chosen leader would be instrumental to act out their interest-based dreams or visions.

Thus a leader- follower matrix is created wherein both parts are bonded together through a convergence of interests. But the essence of leadership is the ability to persuade others to comply voluntarily with one's wishes. Moreover, with some exceptional personal attributes, the leader is to be a superior person, to whom others are found to submit. Again, leadership superiority is to be value-based. Superior values in words and actions of a leader are unhesitatingly venerated by followers. While writing in The Atlantic Monthly in 1994 on "What Makes a Good Leader?" Garry wills captures this leader-follower symbiotic relationship as he writes, "Leaders have a vision. Followers respond to it. Leaders organize a plan. Followers get sorted out to fit the plan. Leaders have willpower. Followers let that will replace their own." Writing almost in the same vein Dr. Henry Kissinger posits that the task of a leader is to take his people from where they are to where they would like to be.

Variants of Leaders/Leadership

Generally speaking, there could be two types of leaders: eventful and event-making. Eventful leadership emerges by cashing in on events or circumstances. A leader of such a background may not always have leadership; but he makes himself indispensable under the exigencies of circumstances. Thus having emerged out of circumstances, such a leader lacks constitutional legitimacy; and may adopt many fiats for leadership legitimation, including the abuse of religion and religious symbols and sentiments. Needless to mention, such a type of leadership is observed in much of the Third World countries; and they are coup-produced military dictators. Bangladesh has had two spells of such military dictatorships between 1975 and 1990. Death through killing removed the progenitor of such a leadership in 1981; while the second one was toppled through people- power demonstrated through a mass upsurge in 1990.

The event-making leadership, on the other hand, is the one which enjoys public confidence and acceptance, and thus legitimate. His process of leadership involves making of events geared to the goal of actualizing the vision shared by him and his followers. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman fits into this type of leadership. He was the epitome of value-based leadership right from the day one of his political career. The two books Unfinished Memoirs and Prison Diaries bear ample testimonies to such an emphatic statement.

In social psychology, leadership is frequently treated as a salient factor in social change. In sociology, leadership is defined as the exercise of influence or power in social collectivities. Max Weber, the doyen of Sociology, discipline, identifies three types of leadership corresponding to the different forms of authority and legitimacy. Firstly, charismatic leaders lead by virtue of the

extraordinary powers attributed to them by their followers. Secondly, traditional leaders lead by virtue of custom and practice, because a certain family or class has always led. Thirdly, legal leadership based on expertise and implemented according to formal rules is typically found in public administration and modern business enterprises.

Leaders and Leadership

When we talk or think of 'leadership' what comes to mind is the activity of the larger-than-life individual who draws his people to pursue goals that he has already committed himself to. Winston Churchill expressing Britain's determination to continue to fight in 1940, Charles de Gaulle imposing his vision of a strong executive Presidency to overcome the paralysis of the Fourth French Republic in 1958, Mahatma Gandhi transforming the Indian Congress into a mass movement to drive out the British through non-violent resistance, and Bangabandhu's call for emancipation and independence on 7 March 1971, are examples of leaders holding a vision for the benefit of their peoples. On the darker side of such a leadership phenomenon, we can cite Adolf Hitler, who won a widespread following from Germans through his continuous tirades against the Versailles Treaty and the treachery of Jews. At this extreme, therefore, we can say that leadership involves a deep commitment by the leader to a mission and/or vision, and that followers accept that commitment.

But a person enjoying the powers and privileges inherent in the role of 'leader' may not necessarily be exercising 'leadership'. President d'Estaing of France, and other heads of government across the world clearly occupied the role of 'leader' in their own countries, yet were continuously assailed for failing to provide the much needed 'leadership' in critical times. Thus we should separate the two terms –'leader' and 'leadership'. But, while separate, these two terms are closely linked. It is quite possible for a leader to obtain compliance with his wishes through force rather than persuasive leadership. Despite this link, there is also an inherent tension between the role of leader and the exercise of leadership, because a leader can use force as well as persuasion to get his way. It is much easier for a leader to see a follower as obeying in response to coercion rather than in response to persuasion.

Qualities of a Good Leader

How does one make a good leader? This is a question that defies a definitive answer. Nevertheless, the following attributes are suggested to be qualities to make a good leader:

1. Inspiration.
2. Integrity.
3. Clear goals.
4. A good example worth following.
5. Vision.
6. Communication ability.
7. Expects the best from followers.
8. Enjoys support of followers.
9. Encouragement for followers.
10. Recognition of followers' contributions.
11. Stimulating personality.
12. Focus on collective rather than personal needs and gains.

13. Exemplary creativity.
14. Courage.

It is not suggested that this is an exhaustive list of values and attributes desirable in a good leader; there could be many more as one imaginative mind ponders over the phenomenon of good leadership.

Concluding Observations

A leader sans values in his attributes is not a leader par excellence; he is at best, a demagogue, who cannot lead his people, except leading himself to mundane, and for that matter, ephemeral gains. At the end of the day; he is outworked by a leader who gains for his people, not for himself. Thus he remains etched indelibly in people’s mind; and he outlasts a demagogue. Perhaps the best definition of such a lasting leader was given by Rabindranath Thakur. In 1921, he wrote to Sir Patrick Geddes: “I do not have faith in any new institutions, but in the people who think properly, feel nobly and act rightly.” Perhaps kiabigaru was not aware that he had given the best tri-dimensional definition of leader and leadership. Indeed, a leader entitles himself to leadership as he demonstrates the three qualities as delineated by Rabindranath.

মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের বিদেশি বন্ধুরা

আবদুর রহমান রাহাদ
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-১৭

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। লাখো শহীদের আত্মত্যাগ আর হাজারো মা-বোনের আত্মসম্মানের বিনিময়েই আজকের এই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে বেশি সুখকর আর কী হতে পারে? শোষকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্তে লড়াই করে পরাধীনতার জাল থেকে বেরিয়ে আসার চেয়ে বেশি গর্বের আর কিছুই হতে পারে না!

কত সহজেই হয়ে যায় বলা! তবে স্বাধীনতা অর্জনের কাজটা অতোটাও সহজ ছিলো না। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফসল হিসাবেই ধরা দিয়েছিলো 'স্বাধীনতা' নামের সেই পরম আরাধ্য সোনার হরিণ। স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে অসংখ্য বাংলাদেশির যেমন অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে তেমনি মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় অসংখ্য মানুষ। আজকে আমরা সেই সব মানুষের কথাই জানবো যারা বাংলাদেশি না হয়েও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রেখে গেছেন।

ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে বীরোচিত অংশগ্রহণের জন্য বীর প্রতীক সম্মান লাভ করেন। তিনিই মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি মুক্তিযোদ্ধা। ওডারল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক হলেও তার জন্ম ১৯১৭ সালে নেদারল্যান্ডের অ্যামস্টারডার্মে। দারিদ্র্যের কারণে ১৮ বছর বয়সে তাকে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে মুচির কাজ করতে হয়েছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি নেদারল্যান্ডের হয়ে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। ওডারল্যান্ড ১৯৭০ সালে ঢাকায় আসেন চাকরির সুবাদে, টঙ্গীর বাটা সু কোম্পানিতে তিনি চাকরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিক থেকেই সক্রিয় ছিলেন ওডারল্যান্ড, অংশ নিয়েছেন পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধেও। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কাজ করে অবসর নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ফেরত যান বীর প্রতীক ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড। ২০০১ সালের ১৮ই মে অস্ট্রেলিয়ার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন বাংলাদেশের সত্যিকারের বন্ধু, এই মহান মুক্তিযোদ্ধা।

এডওয়ার্ড কেনেডি

এডওয়ার্ড কেনেডি ছিলেন তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর। ক্ষমতাশীল রিপাবলিকানরা যখন পাকিস্তানকে সমর্থন জানায় তখন বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলেন এই সিনেটর। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশী শরনার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা নিজ চোখে দেখে তিনি সেই দুর্দশার চিত্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে এনেছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে এডওয়ার্ড কেনেডি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে আসেন। এখানে তিনি একটি শোভাযাত্রায় অংশ নেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কাজ করে গেছেন।

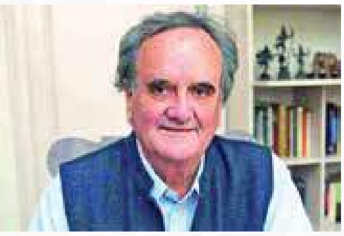

সায়মন ড্রিং

একাত্তর সালে সায়মন ড্রিংয়ের বয়স ছিলো মাত্র ২৭ বছর। তিনি তখন ছিলেন ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর জঘন্য ও নৃশংসতার বিবরণ সংবাদপত্রে তুলে ধরে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বাংলাদেশের গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী প্রথম বিদেশি সাংবাদিক যিনি নিজের

জীবন বিপন্ন করে সরেজমিন প্রতিবেদন তৈরি করে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেন পাকিস্তানী বাহিনীর লোমহর্ষক নির্যাতন ও গণহত্যার কথা।

১৯৭১ সালে ২৫ শে মার্চ কাল রাতে তিনি ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে লুকিয়ে ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনমত সৃষ্টিতে তাঁর করা প্রতিবেদন বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে জোরপূর্বক দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল।

১৯৭১ সালের নভেম্বরে তিনি আবার কলকাতায় আসেন। সেখান থেকে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সকল তথ্য নিরপেক্ষ ভাবে প্রেরণ করতেন।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ বিজয়ের দিনে যৌথ বাহিনীর সাথে তিনিও ঢাকায় এসেছিলেন।

সিডনি শ্যানবার্গ

তিনি ছিলেন দি নিউইয়র্ক টাইমস এর তৎকালীন সাংবাদিক। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ এর হত্যাকাণ্ড তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেন। সে সময় তিনিও ছিলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। হোটেলের জানালা দিয়ে দেখেন ইতিহাসের এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড। তিনি পুরো যুদ্ধকালীন মুক্তিযুদ্ধের উপর অসংখ্য খন্ড খন্ড প্রতিবেদন পাঠান যার অধিকাংশই ছিল শরণার্থী বিষয়ক। তার প্রতিবেদনে পুরো বিশ্ব জানতে পারে পাকবাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ এবং ভারতে অবস্থিত শরণার্থীদের অবস্থা।

কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ

১৯২৬ সালে নিউ জার্সিতে জন্মগ্রহণ করা কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ ছিলেন একজন প্রতিবাদী কবি, যিনি পুঁজিবাদ, আমলাতন্ত্র আর সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সারা জীবন প্রতিবাদ করে গেছেন। ১৯৭১ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কবি ও লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর বাড়িতে বেড়াতে আসেন। সেখান থেকে নৌকায় ঘুরতে ঘুরতে আসেন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা যশোরে। যশোরে এসে সেখানকার শরণার্থী শিবির গুলোতে মানুষের হাহাকার তাকে স্পর্শ করে। তাদের দুঃখ-দুর্দশাকে পুঁজি করেই লিখেন তার সেই বিখ্যাত কবিতা ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’। তৎকালীন তার এ কবিতাটি ছুঁয়ে যায় হাজারো মানুষের হৃদয়।

জে এফ আর জ্যাকব

একাত্তরে তিনি ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ, তখন তার পদমর্যাদা ছিল মেজর জেনারেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে রেখেছিলেন অসামান্য অবদান। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান ছিল অনস্বীকার্য আর এক্ষেত্রে জেনারেল জ্যাকবের বিশাল ভূমিকা ছিল। সীমান্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনীদের জন্য ক্যাম্প স্থাপন, মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পগুলোর পুনর্গঠন, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, অস্ত্র-রসদ যোগান দেওয়াসহ মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথ অভিযানে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখতে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

অ্যান্থনি মাসকারেনহাস

তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় গোয়ানিজ খ্রিস্টান এবং বসবাস সূত্রে পাকিস্তানী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি কিছুকাল এদেশে সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে এসে গণহত্যার তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং এরপর বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনের সানডে টাইম্‌স পত্রিকায় গণহত্যার তথ্যাদি প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তার লেখা বই হচ্ছে “দা রেইপ অব বাংলাদেশ” এবং “বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ”।

আন্দ্রে মালরো

তিনি ছিলেন ফ্রান্সের নাগরিক। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই মালরো একাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ফ্রান্সে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তার সাংস্কৃতিক আন্দোলন আন্তর্জাতিক প্রেরণা হয়ে উজ্জীবিত করেছিল আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের। ফ্রান্স সরকারের উদ্দেশ্যে তার করা আকুতি, "আমাকে একটি যুদ্ধ বিমান দাও, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের শেষ লড়াইটা করতে চাই"।

রবি শংকর, জর্জ হ্যারিসন, বব ডিলান এবং অন্যান্য

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন প্রাঙ্গনে দ্য বিটলস ব্যান্ডের জর্জ হ্যারিসন ও ভারতীয় সেতার বাদক পন্ডিত রবি শংকর কর্তৃক আয়োজিত "দ্যা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" সঙ্গীতানুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় ১লা আগস্ট ১৯৭১ সালে।

রবিশঙ্কর

জর্জ হ্যারিসন

বব ডিলান

এই অনুষ্ঠানে বিশ্ব বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের এক বিশাল দল অংশ নিয়েছিলেন। যাঁদের মধ্যে বব ডিলান (২০১৬ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী), এরিক ক্ল্যাটন, জর্জ হ্যারিসন, বিলি প্রিস্টন, লিয়ন রাসেল ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ব্যান্ড ব্যাড ফিঙ্গার এবং রিঙ্গো রকস্টার ব্যান্ডও "দ্যা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন।

এই কনসার্টের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিকস্তানের (বাংলাদেশ) জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদারদের সীমাহীন অত্যাচার-নিপীড়নের কথা জানতে পারে সারা বিশ্ব। এই কনসার্টের মাধ্যমেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ দাঁড়িয়ে যায় বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের পক্ষে। এই কনসার্টের মাধ্যমে পৃথিবীর মানবতাবাদী মানুষেরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন স্বাধীনচেতা বাঙালির স্বাধীনতার পক্ষে। এই কনসার্টের কারনেই বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও দুর্বল হতে থাকে পাকিস্তানিরা।

কমপক্ষে পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ শুরু করলেও সেই কনসার্ট থেকে অবিশ্বাস্যভাবে প্রায় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার তহবিল সংগৃহিত হয়। কনসার্ট ও অন্যান্য অনুষঙ্গ হতে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের পরিমান ছিলো প্রায় আড়াই লাখ মার্কিন ডলার, যা ইউনিসেফের মাধ্যমে শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হয়। এদের মতোই আরো অসংখ্য নাম না জানা বিদেশি বন্ধুরাও আমাদের মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিলো একাত্তরের সেই সময়টাতে। নিপীড়িত, নিগৃহীত আর শোষিত এক জাতি পূর্ব পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে তারা মানবতার যে উদার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে অনন্তকাল।

আমার গ্রাম

প্রভাষক তাহমিনা সুলতানা
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ
ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ

দেখে আমি অহর্নিশ ওই মায়ামুখ
সদা দোলে হিয়া মাঝে
অকৃত্রিম সুখ।
নীল আকাশ মিশেছে ওই
সবুজ মাঠের ধারে
মন যে কেমন করে আমার প্রাণ যে কেমন করে।
রাত্রি বেলায় ঝিঁ ঝিঁ পোকা
আলো দিয়ে যায় যে একা
মোর এই ছোট ঘরের ধারে,
মন যে কেমন করে আমার প্রাণ যে কেমন করে।
প্রদীপের ওই অল্প আলোয়
ঘুচে যায় সব আঁধার কালো
সেই আলোতে পল্লীবালা গৃহকর্ম সারে,
মন যে কেমন করে আমার প্রাণ যে কেমন করে।
অনাড়ম্বর সাদা-সিধা
আমার সোনার গ্রাম,
সোনা দিয়ে যায়না কভু করা তাহার দাম;
রাখিলে এই বুকটি মোর
ওই রূপালী মাটির পরে,
মন যে কেমন করে আমার প্রাণ যে কেমন করে।

হেমন্তের শেষ শিউলী

মোঃ রুহুল কুদ্দুস
ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯

জানালার পাশে রকিং চেয়ারে বসে পড়তে থাকা বইয়ে হঠাৎ একটা শিউলী ফুল এসে পড়ল। ফুলটা হাতে নিয়ে আনমনেই মনে পড়ে গেল এক বুক রঙিন স্বপ্ন নিয়ে সংসার করতে যাওয়া ষোড়শী সেই শিউলীর কথা। তখন উদয়পুর গ্রামের মধ্যবিত্ত চাষী রজব আলীর সাথে বিয়ে হয় তার। বিয়ের পর থেকেই পাঁচ বোন এক ভাইয়ের সংসারের প্রায় সব গৃহস্থলির ভার পড়ে তার উপর। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বয়স বারো পেরুতেই। তাই পঞ্চম শ্রেণি পাসই ছিল শিক্ষার ইতি। পাঠ্য বইয়ের পিছে যতই বাল্য বিবাহ বিরোধী কথা লেখা থাকুক না কেন তার জীবনে সে সচেতনতার ছোঁয়াই পড়েনি।

বিয়ের পর থেকে বাপের বাড়ি যাওয়া হয়নি মেয়েটার। ওর ছোট ভাই শিমুল একবার এসেছিল ওকে নিতে, তাতে পুরো পরিবার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিল। "বুবুরে নিয়ে এবার শীতে আমাদের বাড়ি চলেন ভাইজান" তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া শিমুল তার দুলাভাইকে আবদার করতেই রজব আলীর মা আছিয়া বেগম বলে উঠলেন, "কেন! তোর বুবুরে আমরা কি মাইরা ফালাইতাছি নাকি, যে তোর বাপ নিজে না আইসা তোরে পাঠায়া আমাগো অপমান করতাছে!" "দুইডা খাট, একটা সাইকেল, একটা গাই আর কয়ডা গয়না ছাড়াতো কিছুই দেয় নাই! আর অহন মান ইজ্জতের মাথা খাইয়া পোলারে পাঠাইছে মাইয়্যা নেওনের নাম কইরা আমাগো অপমান করবার লাইগা?" শিউলী এই অবস্থার গতি প্রকৃতি বুঝে ছোট ভাইটিকে অপমানের জ্বালায় চুলার জ্বলন্ত লাকড়ি বের করে দিল ছ্যাঁকা, উপর্যুপরী বকা ও ভৎর্সনা দিয়ে না খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল যাতে সে আর কখনো এ বাড়ি মুখো না হয়। বুবুকে অবশ্য সে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, তবে সে পরের কথা।

রজব সারাদিন মাঠে কাজ করতো, বিকালে উদয়পুর বাজারে গিয়ে তাস খেলতো। বেশীর ভাগ সময়ে যখন হারতো তখন বাড়ি এসে শিউলীর সাথে নানা প্রকারে ঝগড়া বাধিয়ে ও সময় বিশেষে বিনা কারণে-বেদম প্রহার করা বদ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল তার। শিউলীর ফর্সা গায়ে লাল-নীল-কালো হয়ে থাকতো যন্ত্রনার ছোপগুলো।

প্রচণ্ড ধৈর্য্য ছিল মেয়েটার। তবু শ্বশুরবাড়িতে উঠতে বসতে কথা শুনতে হতো তার। শিউলীর বিয়ের দুই মাসের মাথায়ই বজ্রপাতে মারা যায় তার শ্বশুর। এই বাড়িতে একমাত্র শ্বশুরই যেন তার পরিবার ছিন্ন হবার বেদনা বুঝতো। এই মানুষটার মারা যাওয়ার পর সবাই বলা শুরু করল, " অপয়া মেয়ে এসেই শ্বশুরকে খেলো, কে জানে কালে কালে আরও কি কি খায়।" হয়তো তার শ্বশুর মারা যাওয়ায় অন্যদের থেকে তার কষ্টই বেশী ছিল।

বিয়ের দেড় বছর পর একটি ফুটফুটে মেয়ে হয় তার, স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও নিজের মনের প্রফুল্লতা থাকলেও শ্বশুর বাড়িতে খুশি ছিল না একদম-ই। তবু ধীরে ধীরে সবার কু-দৃষ্টি এড়িয়ে শিউলীর মেয়ের বয়স যখন ছয় মাসে পড়ল তখন অগ্রহায়ণ মাস, আখ কাটার সময়। গ্রামে এই সময় কাজের চাপটা অন্য সময়ের তুলনায় একটু বেশিই থাকে। বিশেষ করে যারা আরেকটু কষ্ট করে আখ ভেঙ্গে রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানায় লাভের অংকটাও তাদের বেড়ে যায়। আখ ভেঙ্গে গুড় বানানো এক কষ্টকর প্রক্রিয়া। এতে বড় উনুন যেমন লাগে তেমনি সালফেটের মত রাসায়নিক দ্রব্যেরও ব্যবহার করা হয়। যাতে গুঁড়ের রঙ পরিষ্কার ও আকর্ষণীয় হয়। বাড়ির একমাত্র বউ হওয়ায় এই কঠিন পরিশ্রমের প্রায় সকল ভার তার ঘাড়েই পড়ে।

সেবার আখের ফলন ভাল হওয়ায় কাজের চাপও বেড়ে যায়। তাই নাওয়া খাওয়ার তোয়াক্কা না করেই মধ্যরাত পর্যন্ত কাজ করতে হতো প্রায়ই। এর মাঝেও হাজার বিষয়ে হাজার টিপ্পনী উঠতে বসতেই শুনতে হতো তাকে। আগে ও কোনো কথার প্রতিবাদ করতো না। কিন্তু এমন-ই এক ব্যস্ততার রাতে আখ ভাঙা রস বের করার সময় কাজের চাপে সকলেরই খাওয়ার হয়নি অনেক রাত পর্যন্ত কিন্তু শিউলীর বাচ্চা মেয়ে 'খুকি' তো আর এত কিছু বুঝে না। তাই কাজ ফেলে যেতে লাগলো মেয়েকে দুধ খাইয়ে শান্ত করবার জন্য। কাজ ফেলে এভাবে দৌড়ে যেতে দেখে চটে গেলেন শাশুড়ী, বললেন, "এদ্দিন সংসারে এক রাক্ষসীর জ্বালায় বাচি নাই অহন আরেকটার জোগাড় হইছে সারাদিন খালি খাই খাই" শিউলী অন্যসব কিছু

এতদিন চুপচাপ সহ্য করে গেলেও সেবার মুখ খুলল। সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি ও এমন বিভিন্ন বাজে কথাশুনে জমে থাকা রাগ, সেই সাথে মেয়ের প্রতি অগাধ ভালবাসা মেশানো এক অবস্থায় দৃঢ় প্রতিবাদ করে ফেলল সে- বলল, “আমার মাইয়্যারে লইয়া কিছু কইবেন না। যা কওনের আমারে কন, যত খুশি কন, কিন্তু খুকিরে লইয়া একদম না।”

সচারচর, এমন উত্তরের অভ্যাস না থাকায় প্রথমে স্তম্ভিত ও মুহূর্তেই কাল নাগিনীর ফণা তুলবার মতন ফুঁসে উঠল তাঁর শ্বাশুড়ী। নিজের ছেলে রজব আলীকে ডেকে মায়া কান্না জুড়ে দিলেন। রজব আলী ইতোপূর্বে কোনো কালে মায়ের বাধ্যগত ছেলে ছিল তা জানা না গেলেও বউকে পেটানো নিজের অনিবার্য কর্তব্য হিসেবে গণ্য করল। মায়ের প্রতি মুহূর্তেই উথলে পড়া ভালবাসায় কোনো কারণের বা শিউলীর বারনের তোয়াক্কা না করেই তাকে মারতে উদ্যত হলো সে। দৌঁড়ে ঘরের সিঁড়ির চৌকাঠে ক্ষুধায় কাঁদতে থাকা আদরের খুকিকে বসিয়ে রেখে উঠানে ফিরে স্বামীর দিকে এগিয়ে এসে বলল, “আইজ আমার কথা না শুইনা গায়ে হাত দিলে কামডা ভালা অইবো না। আপনাগো জ্বালায় আমি সালফেট খাইয়া অনেক আগেই মইরা যাইতাম যদি খালি খুকি না থাকতো।” ...... ওর কথা শেষ হতে না হতেই আছিয়া বেগম খপ করে চুলের মুঠি ধরে বললেন,“ কত্তোবড় সাহস মাইয়্যার দ্যাখছো নি। মুখে মুখে তক্ক করে। রজব!!! বাজান আইজ আর ছাড়িস না এরে।” চুলের মুঠি ধরতেই চিৎকার করে উঠতে গেল শিউলী, সেই সুযোগে রজব আলী সালফেটের পুরো থলেটা মুখ ধরে ঢেলে দিল ভিতরে। আর বলতে লাগল, “খা এবার, জনমের খায়েশ মেটাইয়া দেই তবে, কত খাইতে পারিস খা।” দম নিতে না পেরেই হয়তো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কয়েকবার পা দাপিয়ে শুব্ধ হয়ে যায় শিউলী। পাশবিক উন্মাদনায় চিত্রাংগদা নৃত্য করল তারা। তবে ঘোর কাটতে দেরি হলো না তাদের। কী বীভৎস কাজ করে ফেলেছে তারা! আর এর ভয়ংকর পরিণতি কি হতে পারে তা ভাবতেই ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল তারা। রাতে আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত যায় কিন্তু আখ ভাঙ্গা কলের আওয়াজে শিউলীর দুর্বল চিৎকার চাপা পড়ে যায়। আর সেজন্য পাড়ার লোকজন ভোরের আগে জানতেও পারেনা এ মৃত্যুর ঘটনা।

ঐ দিন সকালে খবর পেয়েই মেয়ের বাবা লোকজন নিয়ে এসে ছিল। শিউলীর ছোট ভাইটিও কিন্তু এসেছিল তার বুবুকে বাড়ি নিয়ে যেতে। ব্যাপারটা আত্মহত্যার নামেই রফাদফা হয়ে গেল। এলাকার লোকজন তখন পিঠপিছে সন্দেহ করলেও কেউ সামনে কিছু বলল না এমন কি রজবের পাঁচ বোনেরা ও না। মেয়ের বাবা টু শব্দ না করেই লাশ নিয়ে চলে গেল। তবে এ ঘটনার সবটাই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছিয়া বেগমের ছোট মেয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিল।

রাতে কাঁদতে থাকা মা-হারা খুকির কান্না সেদিন সকালেও থামেনি বরং চাপা কষ্টের আর্তনাদ ক্রমেই তীব্র হতে থাকে। এ সমাজ অনেক কিছুই ভুলে যায়। কালে কালে কত শিউলীরা এভাবেই ঝরে যায় তার হিসাবও কেউ রাখে না। শিউলীর এ ঘটনার মত খুকিকেও ভুলে যায় সবাই। কে জানে হয়তো খুকির জীবনের গল্পও এমন হবে, অথবা হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম এক প্রতিরোধের ইতিহাস।

Greatness lies in nowhere

Rafia Atkia Rafa
Deptartment of English, Session : 2018-19

"Greatness lies where?"
Asks the essence to the soul.
"Is it there on the clothe you wear?
In your coat page diaries?
Or in the sharpest shoe blade flayers;
Desktop demenour Shayaris'?

Shimmering on the wardrobe sides,
Blazes from your ink?"

"In your mindful ties and lies"
Says the beautiful pimp.

"In your empty Lockwood file,
Where you smell the sun."
Says the burned shrine
Of Youzu,
Grandeur Pompey shun.

"I have seen the light of wisdom;
Plucking the flowers of eve.
Eye that corners tears aside and
Bringing the sound of grieve."
Says the grass that witnessed all; it
Cries on it's believe.

Its always out of nowhere,
The wisdom that cracks down!
At dawn till dusk
In fire's breathe,
Knowing nothingness
On the ground.
Wisdom sometimes grows inside
The deepest fearsome, bricklayers.
Greatness greatly
Greet them all
With mouth organs
Of Sumu's heir.

আকস্মিক

রিয়াদ হুসাইন
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-১৭

রেডিয়ামের ঘড়িতে তাকাতেই দেখি রাত পৌনে ১০টা বাজে। আকাশে চতুর্দশীর পূর্ণ চাঁদ, ঝলমলে আলো ঠিকরে বের হচ্ছে তার সারা গায়ে। চৌরাস্তার মোড়ে কালভার্টের উপর বসে আছি, একদৃষ্টে চাঁদের দিকে তাকিয়ে। কালভার্টের নিচ দিয়ে একটা সরু স্রোতধারা কলকল শব্দে বয়ে চলছে। পাশেই দক্ষিণে একটা খড়ের গাদা এবং সবকিছু ছাড়িয়ে ওঠা একটা অশ্বত্থ গাছ, শীতল মৃদু বাতাসে পাতাগুলো থেকে থেকে অগোছালো চুলের মতো নড়ছে। গ্রীষ্মের মাঝামাঝিতে একপশলা বৃষ্টিতে ধানকাটা মাঠে হালকা পানি জমেছে। ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙেরা ডেকে চলছে সমানতালে। মাঝেমাঝে দূর গ্রাম থেকে ভেসে আসছে শিয়ালের চাপা ডাক। আশপাশের কুকুরগুলোও থেমে থেমে ডাকছে, যেন শিয়ালদের ডাকেরই উত্তর দিচ্ছে। মাঝেমধ্যে ক্রিং ক্রিং বেল বাজিয়ে দু-একটা সাইকেল-রিকশা এদিক ওদিক যাচ্ছে। পায়ে হাঁটা মানুষজন দূরের হাট থেকে বাজারের ব্যাগ-বোঝা নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরছে।

অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে অপেক্ষা করছি কিন্তু রতনের কোনো পাত্তা নেই। আর কতক্ষণ এভাবে একা একা বসে থাকবো এদিকে রাত গড়িয়ে যাচ্ছে।

লেখাপড়ার সুবাদে শহরে থাকি। ক্লাস, পরীক্ষা, টিউশনি সব মিলিয়ে জগাখিঁচুড়ি ধরনের ব্যস্ততায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম গত দু-তিন মাসে। গ্রামের একটুখানি সতেজ হাওয়ার জন্যে মনটা বড্ড ছটপট করতো, বাড়ির জন্যেও খারাপ লাগতো না যে তা নয়।

শৈশব-কৈশোরের পুরোটাই কাটে এ গ্রামে। কতই না মজার ছিল এই গ্রাম্য জীবন। সারাদিন দস্যিপনা, বন্ধুদের সাথে ঘুরাঘুরি, গভীররাতে হাটফেরত মানুষদের ভয় দেখানো, টিনের চালে ঢিল মারা, কোন বাগানে কোন ফল পেকেছে, কোন খেতে কি চাষ হয়েছে, কোন গাছে ঘুঘু, শালিক, টিয়ারা বাসা বেঁধেছে, গভীররাতে দূরের জঙ্গলে হুতোমপেঁচার ডাক , আরো কত কি!

গতকাল দুপুর দু'টা নাগাদ বাড়ি এসে পৌঁছি। এসেই গোসল, খাওয়া-দাওয়া তারপর একটা লম্বা ঘুম। সন্ধ্যার পর বের হতেই ছোটবেলার প্রিয় বন্ধু রতনের সাথে দেখা। ওর প্রস্তাবেই মন্ডলদের বাগানে কাঁঠাল পাড়ার পরিকল্পনা করি। পরিকল্পনা অনুযায়ী আজকে এখানে আসা।

বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবছি। হঠাৎ কাঁধের উপর একটা মৃদু হাতের স্পর্শে চমকে উঠি। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি রতন। চাঁদের আলোয় চকমকে দাঁত কপাটি বের করে শব্দহীনভাবে হাসছে। ছিপছিপে পাতলা শারীরিক গঠন। গায়ে একটা পুরনো হাফ-হাতা শার্ট ও পরনে একটা প্যান্ট। এ কদিনে বড্ড রোগা হয়ে গেছে ছেলেটা, দেখলেই কেমন যেন মায়া জন্মে- এ যেন কোন এক দুর্ভিক্ষের জ্যান্ত সাক্ষী।

: কিরে কেমন চমকে দিলাম বল? অতি উৎসাহে রতন জিজ্ঞেস করে।

: চেহারার যে একখানা দশা বানিয়েছিস যে কেউ তোকে দেখে চমকে উঠবে। তো আসতে এত দেরি করলি কেন? কি এমন মহাকর্মে ব্যস্ত ছিলি?

: আরেহ সবার চোখ এড়িয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নাকি! সামান্য বিষয় নিয়েও অতিসাবধানতা রতনের মজ্জাগত অভ্যাস।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে মন্ডলদের বাগানে যাওয়ার জন্যে তাড়া দিলাম।

সদ্য পাকা করা রাস্তা ধরে হাঁটছি আমরা। নিস্তব্ধ রাতে পাথরের ঘষায় জুতোর নিম্নদেশ থেকে অদ্ভুত শব্দ আসছে।

: আচ্ছা রতন, শেষ কবে আমরা এরকম অভিযানে বের হয়েছিলাম মনে পড়ে?

: মাস তিন-চারেক তো হবেই। শীতল কণ্ঠে রতন উত্তর দেয়।

: এই যে লম্বা একটা সময় আমি গ্রামে ছিলাম না তখন আমায় মিস করিস নি?

: সে আর বলতে!

: দেখছিস, আজকের রাতটা বড্ড সুন্দর, চারপাশে কেমন যেন একটা স্বর্গীয় পরিবেশ বিরাজ করছে। এরকম একটা অভিযানের জন্য আজকের রাতটা জুতসই।

: হুম, রাত, সে বড় অদ্ভুত জিনিস। কারো কাছে স্বর্গীয় আর কারো কাছে ভীষণ ভয়ের।

খানিকটা সামনেই পাড়ার কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আমরা ওদের পাশ দিয়ে যেতেই কেমন যেন এক অদ্ভুত চাহনিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমাদের দিকে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমরা হাঁটতে থাকি।

পাকা রাস্তা শেষ হতেই খানিকটা জল-কাদা মেশানো কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে গোপালদের বাঁশবাগানের ভিতর দিয়ে পায়ে হাঁটা সরু রাস্তা ধরে হাঁটছি। বাঁশপাতার ফাঁক দিয়ে ঠিকরে পড়া চাঁদের আলো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। গা ছমছম নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে এগিয়ে চলছি আমরা।

বাঁশবাগান পেরিয়ে একটা আঁখক্ষেত, তারপরেই মন্ডলদের বাগান। বিশাল বাগান।

বাগানে পৌঁছেই রতন আমার আগে আগে হেঁটে একটা লম্বা, ঝাঁকড়া ধরনের গাছের নিচে গিয়ে থেমে বলল- এটা থেকে পাড়ব। এর কাঁঠাল এই বাগানের সবচাইতে ভালো কাঁঠাল।

: বাহ্, এ বাগানের নাড়ি-নক্ষত্র সব তোর ভালোই জানা আছে দেখছি!

: থাকবে না! এখন তো বেশিরভাগ সময় আমার এখানেই কাটে।

রতনকে নিচে পাহারায় রেখে আমি গাছে উঠতে শুরু করি। খানিকটা উঠেই হাঁপিয়ে উঠি, দীর্ঘদিনের অনভ্যাসের ফল। গাছ তুলনামূলক লম্বা হওয়ায় ভালোই বেগ পেতে হয়েছে। কোনোমতে চূড়ায় উঠে খানিকটা জিরিয়ে নিচ্ছি। নিচে রতনের সতর্ক পাহারা এবং অতি সাবধানী নড়াচড়া ফর্সা চাঁদের আলোয় লক্ষণীয়, পাছে কেউ টের পাবে। দূরেই পাহারারত চৌকিদারের হারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছে।

রতন অতি আস্তে শিস বাজিয়ে ইঙ্গিত দিতেই কাঁঠাল ছিঁড়তে উদ্যত হই। সুচালো কাঁটাযুক্ত, মাঝারি আকারের কাঁঠালগুলো হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখছি, ভালোই ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে।

নরম দেখে একটা ছিঁড়ে সাথে করে আনা পাটের বস্তায় ভরে গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে দিই, পরে নামার সময় আস্তে আস্তে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে নামিয়ে নেব।

তিনটা ছিঁড়তেই হাতে প্রচন্ড ব্যথা করছে। একটু থেমে হাতের কব্জি এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে সামান্য নেড়ে নিলাম। আবার কাঁঠাল ছেঁড়ায় মন দিলাম। আরও কয়েকটা পেড়েও ফেলি।

একটা কাঁঠাল ছিঁড়ে হাতে নিতেই থমকে যাই। ওজনে হালকা, খানিকটা সাদা রঙের কিছু একটা আমি হাতে ধরে আছি যা কাঁঠাল হতেই পারেনা। কি ওটা তাহলে?

ভালো করে দেখার জন্যে চোখের সামনে আনি ওটাকে। যেটা দেখলাম নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। ওটা একটা বিশুদ্ধ মরা মানুষের মাথার খুলি। খুলির কোথাও একফোঁটা মাংস নেই, জ্বলজ্বলে চোখদুটো সে কি এক অমানবিক ভয়ংকর দৃষ্টিতে পূর্ণ কৌতুহলে যেন তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

কাঁপা কাঁপা হাতে ওটাকে আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারিনি। মাথাটাও ঘুরছে সেই সাথে চোখে নেমে আসছে অমানিশার অন্ধকার। গাছটাকেও আর ধরে রাখতে পারিনি বেশিক্ষণ, হাত-পায়ের বন্ধনী আলগা হতেই নিচে পড়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কোত্থেকে একটা হাত এসে আমার ডান হাত ধরে ফেলে। লেশমাত্র মাংসের ছিটেফোঁটা নেই হাতটাতে, অস্বাভাবিক রকম ঠান্ডা যেন কয়েকটা বরফদন্ডে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে আমার হাত। হাতের মালিকের দিকে চাইতেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়ার উপক্রম। এ দৃশ্য কখনো ভোলার নয়। মনুষ্যাকৃতির একটি মূর্তি, গায়ে একটা হাফ-হাতা শার্ট। ইটভাটার জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের ন্যায় চোখদুটো ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যেকোনো মুহূর্তে ভস্ম হয়ে যেতে পারি ঐ অগ্নিদৃষ্টিতে। ঘটনার আকস্মিকতা এতটাই প্রবল ছিল যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না, মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে একটা আর্তনাদ বের হয়ে তারপর আর কিছুই মনে নেই।

জ্ঞান ফিরতেই চোখ খুলে শোবার ঘরে নিজেকে আবিষ্কার করি। মা-বাবা, ছোটবোন, মেজোচাচা সবাই আমাকে ঘিরে বসে আছে। আমাকে চোখ খুলতে দেখে সবার মাঝে স্বস্তি ফিরে এলো। গতরাতে মন্ডলদের বাগানে চিৎকার শুনে চৌকিদার এসে অচেতন অবস্থায় আমাকে আবিষ্কার করে। চিনতে পেরে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যায়।

চোখ পিটপিট করে চারদিকে তাকাচ্ছি, রতনকে খুঁজছি।

: কি খুঁজছিস বাবা? করুন কণ্ঠে মা জিজ্ঞেস করে।

: রতন কই মা? উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

জবাবে অবাক ভঙ্গিতে মা যেটা বললো তার জন্যে আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। ক্রমাগত আকস্মিকতার প্রবল ধাক্কায় মাথাটা আচমকা ঘুরে উঠে।

দিন বিশেক আগে গাছ থেকে পড়ে রতন মারা যায়। মন্ডলদের বাগানে, সেই ঝাঁকড়া মতন কাঁঠাল গাছ থেকেই পড়ে মারা যায় ....

ব্যাপ্তিকাল

আব্দুল্লাহ আর রাকিব
ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-১৮

বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর নিরর্থক বুলি আওড়াইনা।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর বাবার কাছে পড়া হয় না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর কাপড়ে দাগ লাগার ভয় পাইনা।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর অল্পতেই খুশিতে আত্মহারা হই না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর সহজেই মন খারাপ হয়না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর কাটা-ছেড়া লুকাইনা।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর স্যারের বেত এর বারি পড়ে না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর জুটি করে কান ধরে ক্লাসের বাইরে দাঁড়ানো হয় না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর খাতার শেষ পৃষ্ঠায় খেলা থাকে না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর সুপার পাওয়ার চাই না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর নতুন বইয়ের গন্ধ নেয়া হয় না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর ছুটি শেষে খেলার সময় আসে না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর কোথাও ঘুরতে গেলে কেউ বাঁধ সাধে না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর লুকিয়ে গল্পের বই পড়ে ধরা খেতে হয় না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর খুচরো পয়সা জমাতে হয় না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর সিনেমাকে সত্য ভাবিনা।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর কারো কাছে বেড়াতে যাওয়ার বায়না ধরিনা।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর রাতের প্রথম প্রহরেই ঘুমানোর নিয়ম থাকে না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর আড়ি কেটে ভাব হয় না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর বায়না খাটে না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর চঞ্চলতা আসে না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর কেউ অমোঘ নিয়মে আটকে দেয় না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
আজকাল আর সরল অঙ্ক কষি না।
বয়সটা যে বড্ড বেড়েছে,
সত্যিই বয়সটা যে বেড়েছে, তাই-
আজকাল আর এসব নাড়া দেয় না॥

August Night Raiders

Zulker Nayen Mahmud
Department of Development Studies, Session : 2015-16

During our liberation war many laid their lives. It was a time when ordinary men were asked to do extraordinary things. Lieutenant Alif was one of those many valiant sons.

On August 10th, 1971 Lieutenant Alif was ordered to attack Rohanpur BOP. Lt. Alif a fresh graduate out of PMA devised his plan in textbook manner. He divided his men in three teams. The two-man LMG crew as Suppressive fire team. A three-man Fire team they will move with the false assault team but will halt 700 meters from the target, the false assault team will move in close to get a better look. 15 minutes into operation LMG crew will fire at BOP. 5 minutes after them the Fire team will open up and the false assault team will move in to the 500-meter perimeter and mount a false assault to observe Pakistani response. Lt. Alif will lead false assault team, Lance Naik Amir Ali and Sepoy Mooqbul will be LMG crew, Sepoy Masood, Sepoy Hamim and Sepoy Hasan will be Fire team. Lt. Alif, Sepoy Shahed, Morshed, Liakat and Golam will be false assault team. Fire team will provide security and assist the false assault team and LMG crew will provide suppressive fire for both the team.

According to plan the false assault team and Fire team will move from the South flank but fire team will take up position on the Southeastern that is right flank of false assault team. After fire team starts firing the false assault team will slowly move close and fire at the enemy position and observe them and understand their strength.

2300hrs the Indian Artillery shelling started. Under the cover of shelling the freedom fighters moved silently but ferociously. At no man’s land, the LMG crew went left. They took position at Perfect West. The rest moved to their designated areas. After the bombardment stopped the LMG crew lighted up the BOP 3 minutes before their time. But it was not a problem. The Pakistanis thought the BSF and Freedom Fighters are mounting an assault to cross the border and take over the BOP. So, they concentrated all their fire on the West. But Fire team opened up and the BOP got confused. They divided their firepower. False assault team slowly moved up and as per plan, mocked an assault. 45 minutes into operation Lt. Alif gave signal to peel off. That is one man move back and take position and provide cover for next man this way the entire team will fall back. Fire team moved first. Then Alif and his team but halfway to no man’s land they get pinned by mortar fire. Alif ordered digging in. They took position in a pond. No man land was 2 km from that place. Fire team came up and took a defensive position 200m Southeast of the pond to prevent enemy flanking move. LMG crew dismounted and moved southward and took up position in the Southwest of the pond in the no man’s Land. Lt. Alif relayed a message to base "Baseplate, Baseplate this is Delta 2 Lead. Send Balance of the squad. I repeat send Balance. Creditor is heavy and charging." The return was "Delta 2 Lead, balance is Oscar Mike. Hold account. Baseplate out" Now he has to fight the counter attack if the Pakistanis mount one. And Pakistanis always turn back and attack. He hopes that it doesn't happen. His entire team are positioned in a opposite Defensive C perimeter. Now his only hope is the reinforcement team's attack from Perfect West. He looked at his watch, it was 0000hrs.

0200hrs Pakistanis mounted their first attack. Almost 2 hours after they pinned Lt. Alif and his team. Although it was dealt with furious reply. When Lt. Alif thought that the second attack was about to start he did an ammo check. He sent two runners out, one to the LMG position and the other to the fire team. His runners came back with reports that gave him chills down his spine. His LMG had 1000 rounds and his rifle team had 50-60 round each. He and Lance Naik Amir Ali had SMG. They together had 180 rounds. So, in total he had about 1530 - 1600 rounds against an enemy who is stacked on huge amount of ammo and various armaments. But the reinforcements made their move just on time. But the assault team sent to destroy Alif's entire team, continued its approach. But it couldn't continue long enough as the BSF also opened up from their BOP. So, Alif got his short window. He ordered full retreat. It seemed that mission was successful. But when looked back he saw Sepoy Maqbool was the last to leave. He felt a bullet sizzle pass him and hit Golam. He heard another scream. He looked back Sepoy Maqbool was on the ground. Alive. But badly wounded. He looked at Golam, shot in the shoulder and a bullet grazed his waist. Maqbool was still alive. Alif made a dash and reached him. Asked where he is hit. He said, "sir go, I will cover you." "Shut up Maqbool. Give me your gamcha, I will tie it around under your arms and pull you. Keep that gun firing and kill as many as you can." Lt. Alif started pulling him and Maqbool kept firing. It took 20 mins for them to cross 1 mile in to the no man’s land and suddenly Lt. Alif felt something hitting him. Maqbool Looked up and so a single bullet wound in the back of Lt. Alif. But he continued and made it into the Indian territory. When the operation was over it was almost dawn. When they came back to camp the Fazar Azan was being given in a nearby mosque. Lt. Alif had lost too much blood, he slowly faded. The intel collected by Lt. Alif and his team helped in the main assault. Golam and Maqbool were sent to Hospital for better treatment.

“N.B: This story was composed by the writer himself. None of the characters resemble any living or martyred freedom fighter.”

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : সহজ সরল আলোচনা

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, ডিজাস্টার অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট

"দুর্যোগ" শব্দটা শুনলেই আমাদের একটা ভয় কাজ করে, কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে এই চিন্তা কাজ করে। দুর্যোগ আর ক্ষতি সরাসরি সংযুক্ত। সেই আদিম কাল থেকে দুর্যোগ আসছে, মানুষও চেষ্টা করে যাচ্ছে এর থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। আমরা যদি পেছনের দিকে তাকাই দেখতে পাব মানুষের বিভিন্নভাবে চেষ্টা এই দুর্যোগ থেকে কীভাবে বাঁচা যায়, কীভাবে ক্ষতির পরিমাণটা হ্রাস করা যায়। নূহ (আঃ) এর উম্মতদের কথাই যদি বলি, নূহ (আঃ) আগাম সংবাদ (আর্লি ওয়ার্নিং) পেয়েছিলেন বন্যা আসবে, এবং শুধু তাই না, এর থেকে বাঁচার পূর্বে কি কি করতে হবে (মিটিগেশন) সেই প্লানও (প্রিপেয়ার্ডনেস) তিনি জেনেছিলেন। এবং সেই ভয়ংকর বন্যা যখন এসেই পড়ল তখন কিভাবে ওনারা বাঁচলেন (রেসপন্স) তাও আমরা জানতে পারি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে।

আমরা যদি নূহ (আঃ) এর উম্মতদের কথাই চিন্তা করি, তাহলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চার ধাপে ভাগ করা যেতে পারে। দুইটা ধাপ দুর্যোগ আসার আগে (মিটিগেশন এবং প্রিপেয়ার্ডনেস), একটা দুর্যোগের সময়ে (রেসপন্স), আর শেষেরটা দুর্যোগ আসার পর যে ক্ষতি হয়েছে তার থেকে পূর্বের অবস্থা অথবা তার থেকেও ভাল অবস্থায় কিভাবে ফিরে যাওয়া যায় (রিকভারি)।

দুর্যোগ আসার আগে অন্তত ৪টা ধাপ পার করে আসতে হয় (উপরের ধাপ গুলো নয়), আর ঐ ৪টা ধাপ পার হওয়ার পরেই আমরা বলি দুর্যোগ হয়েছে। আমরা যদি প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয় (ন্যাচারাল হ্যাজার্ড) এর কথা বলি, যেমন বন্যা অথবা ভূমিকম্প, এই ভূমিকম্প কি দুর্যোগ? এই ভূমিকম্প যে কোন জায়গায় হলেই কি আমরা বলব দুর্যোগ হয়েছে? কখনই না। বরং এই ভূমিকম্প যখন মানুষের ক্ষতি করছে তখনই আমরা বলছি দুর্যোগ হয়েছে। তো বিপর্যয় (হ্যাজার্ড) এবং ক্ষতি, দুইটা ধাপ এর মাঝে আরও দুইটা ধাপ আছে, ঐ যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলেছিলাম, এই বিপত্তি কোন মনুষ্য গোষ্ঠীর উপরে আঘাত হানতে হবে, যেমন ভূমিকম্পই যদি বলি, ভূমিকম্প মানুষ্যহীন কোন জায়গায় হল, তাহলে দুর্যোগ বলব না। তাহলে ২য় ধাপ হচ্ছে মানুষ। বিপর্যয় এবং মানুষ হচ্ছে ১ম এবং ২য় ধাপ, ৪র্থ ধাপ হলো ক্ষতি। আর ৩য় ধাপ হচ্ছে এই যে মানুষের অবস্থান (এক্সপোসার) এবং অবস্থা (ভালনেরাবিলিটি)। আর একটু যদি বিস্তারিত বলি, ঐ যে ভূমিকম্প কোন মনুষ্য গোষ্ঠীর উপরে আঘাত হানলেই কি ক্ষতি হবে? যার ফলে আমরা বলব দুর্যোগ নেমে এসেছে। এই ক্ষতির মানদন্ডটা নির্ধারণ করবে ভূমিকম্প অথবা অন্য কোন বিপর্যয় কতটা শক্তিশালী আর এর সাথে মনুষ্য গোষ্ঠীর ঐ যে অবস্থান এবং অবস্থার উপর। মনুষ্য গোষ্ঠী কোথায় আছে এবং কিভাবে আছে। যেমন উপকূলীয় এলাকায় যারা আছেন তাঁদের উপর ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, বন্যা আঘাত হানার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আবার ঐ এলাকায় থাকলেও তাঁরা যদি ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, বন্যা সম্পর্কে আগে থেকেই অবহিত থাকেন, তাঁদের অবস্থা প্রস্তুত রাখেন তাহলে তাঁরা ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারেন, অথবা বলতে পারি দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। এই অবস্থাকে আমরা আবার বিভিন্ন মানদণ্ডে পরিমাপ করতে পারি। যেমন, কোন মনুষ্য গোষ্ঠী দুর্যোগ সম্পর্কে কতটা অবহিত, তাঁদের ঘর বাড়ি কেমন, ঝড় আসলে মোকাবেলা করার মতো শক্তিশালী কিনা, যদি ঘর ভেঙ্গেও যায়, অথবা থাকার মতো অবস্থা না হয়, তাহলে ঐ মনুষ্য গোষ্ঠীতে আশ্রয় কেন্দ্র আছে কিনা, বিদ্যালয় আছে কিনা, আগুন নেভানোর কেন্দ্র আছে কিনা, হাসপাতাল আছে কিনা, বাঁধ আছে কিনা, মিষ্টি খাবার পানির ব্যবস্থা আছে কিনা, আবার ঐ মনুষ্য গোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থা কেমন, সমাজে মিলমিশ কেমন, একজন আর একজন কে চেনেন কিনা, জানেন কিনা, কেউ বিপদে পড়লে ছুটে আসেন কিনা, তাঁদের সমাজে শিশু, মেয়ে, বয়স্ক এবং কোন বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা বেশি না কম, তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন, মানুষ শুধু একটা পেশার উপরই নির্ভরশীল কিনা যে পেশা যে কোন বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিনা, আশেপাশের গাছপালা কেমন, পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে কিনা, এইসব কিছুর সাথে আরও অনেক কিছু নির্ধারণ করে দেয় ঐ মনুষ্য গোষ্ঠীর অবস্থা। আর এই অবস্থা, অবস্থান যখন ভাল হয়, তখন একে বলি সক্ষমতা (কোপিং

ক্যাপাসিটি), তখন বিপর্যয় আসলেও ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে, অর্থাৎ দুর্যোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। আর এই অবস্থান এবং অবস্থাই হচ্ছে ৩য় ধাপ। এখন ধাপগুলো যদি একবারে আবার একটু দেখি, যখন কোন প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয় কোন মনুষ্য গোষ্ঠীর উপর আঘাত হানে এবং মনুষ্য গোষ্ঠীর অবস্থান এবং অবস্থা কে অতিক্রম করে ক্ষতির সম্মুখীন করে তখনই আমরা এই অবস্থাকে বলছি দুর্যোগ। আমরা বলি দুর্যোগ নেমে এসেছে। তো এই দুর্যোগকে থামান অথবা এর থেকে ক্ষতির পরিমাণ কমানোকেই বলছি আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। যদিও মানুষ আদিম কাল থেকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে আসছে এবং এর থেকে বাঁচার চেষ্টাও করে যাচ্ছে। তবে তা সেইভাবে গোছাল অথবা কার্যকরী ছিল কিনা, প্রশ্ন থেকেই যায়।

১৯২৩ সালে টোকিও শহর দেখেছিল ভয়ংকর ভূমিকম্পের তান্ডব। এর পর থেকে টোকিওসহ গোটা জাপান দুর্যোগ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপানের কালচার, সমাজে এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মিশে যায়। জাপানের স্কুলের প্রথম দিনেই বাচ্চাদের শেখান হয় দুর্যোগ কী এবং এর থেকে বাঁচতে কী করতে হবে।

১৯৭০ সালে বাংলাদেশে যে প্রলয়কারী ঝড়ে আর লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু, এখনো আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই ভয়ংকর ঝড় এর কথা। বাংলাদেশ সরকার আর তখন কার রেড ক্রিসেন্ট শুরু করে এখন পর্যন্ত ঝড় এর জন্য অন্যতম সাফল্যমন্ডিত প্রোগ্রাম "সাইক্লোন প্রিপেয়ারডনেস প্রোগ্রাম"। বাংলাদেশ এখন কিছুটা হলেও ঝড় এর জন্য পূর্বের থেকে অনেকখানি প্রস্তুত। মানুষ এখন ঝড় আসার আগে কি কি করতে হবে কিছুটা হলেও জানে। আর এগুলোই হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। আর এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা, কী কী করা দরকার, কী কী ভুল ছিল, সেই ভুলগুলো কিভাবে শুধরান যায়, অথবা নতুন কোনও দুর্যোগ ঝুঁকি হওয়ার সম্ভাবনা কেমন, এই নতুন দুর্যোগ ঝুঁকিকে কিভাবে প্রতিরোধ আর পুরানো সব দুর্যোগ ঝুঁকি কিভাবে হ্রাস করা যায় এটাই হচ্ছে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরন, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনারই অংশ। আর এইসব নিয়েই নতুন গবেষণা, পড়াশোনা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে, যা এতদিন জাপান, ইউরোপ, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলো করছে, বাংলাদেশেও শুরু করেছে সম্পূর্ণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা, যা খুবই আশাব্যঞ্জক।

Northern Light

Md. Arif Jawad Fahim
Department of English, Session : 2016-17

Nihal was frustrated and could not fall asleep. Through the windows he was looking outside with an unstirred eye. A lot of things were rushing in his mind. The main cause of his frustration he figured that he was not like before. He was thinking he became more destructive and amused that how his friends changed beyond his imagination. In the heart he knew that he was not confident to mix up with his friends for a narrow feeling. He thought like no one cared about him anymore as he lost everything exceptional, he possesses. Reminiscing about his past and current condition he was falling deeper and deeper until unconsciously a drop of tear felled apart.

Coldness of the night breeze makes him feel that drop. He was now thinking why anything good was not happening to him. Absent mindedly he thought that it would be great if he could see a falling star and make a wish so that his fortune could change. Without a blink he was now looking for very uncommon phenomena with a hopeful heart. He was not conscious about anything now not even about the time; just with a mild craziness he opted to stare at sky without a blink. A distant search light he could trace in the empty sky. He was now thinking from where the light might come from. It may be from the airport or may be from a helipad. But he could not fix and suddenly he had the feeling to saw something was falling from the sky. He was bumped and at loss. He once read a line that what you seek is also seeking you triggered his mind. He was unreasonably satisfied what happened to him and thinking to and fro he fell asleep. The next night he was enthusiastic to know about the mysterious sky. He searched in Google about mysterious sky and an amazing unworldly view of northern lights pierced his mind. He came to know that this light can be seen in North and South Pole of earth; due to the emission of solar energy from particles this amazing scenery are created in the limitless sky. So, these particles are leaving there previous state and crafting something heavenly. So Nihal wanted to leave his past state behind and he was motivated to create something worth seeing. He was saying to himself that past glory became my present sorrow. But what makes the difference between these two conditions. He found out that he had a tendency to overcome barriers and now he became pale about feelings.

Another problem came into his mind he does not like himself that much now. So in messy state he was convincing himself that if I cannot live for myself I would live for others. He thought I would be useful to those who cannot help themselves. However, he was not able to select a way to help mass less privileged people. He started to do work with voluntary organizations and came to know about their sufferings from close. He was also exposed to the helplessness of people. He was a annoyed gipsy trying to sacrifice his life for others. Now and then he looked at the vast beloved sky and understood the vagueness and smallness of existence deeply. Now seeing suffered people was his addiction and he tried his best from his heart. He was callous about others as he thought not everyone can understand the magic of life and creating it worth seeing. He thought why our sky is

just a blank sky. He was searching every opportunity to bring the torch of northern light to himself so he would be enlightened by enlighting others. He was roaming in the streets and found few street children were starving and asking for food from everyone. He gave all his money to them and was thinking if he could do something big for all the street children. By talking to his friends and he came up with a plan of self-sufficient project. He engaged himself with various works and stated saving money to do something sustaining and big. He tried and tried and at the end of his life he created a full self-sufficient almshouse where the less privileged children are grown up for greater purpose. In a gathering of that home he shared the amazing view of northern lights with the children and by their expression he could get that all of them were astonished hearing this. In his next visit one of the children saw him and said here comes our northern light.

বৃষ্টি

মোছাঃ শরীফা ইয়াসমিন
শিক্ষক, স্নেহনীড় ডে-কেয়ার সেন্টার

বৃষ্টি পড়ে টিনের চালে
ঝুমঝুমিয়ে হাওয়ার তালে,
বৃষ্টি পড়ে রাত দুপুরে
নদ-নদী আর বিল পুকুরে ।।
বৃষ্টি পড়ে গাছের পাতায়
বন-বনানীর শাখায় শাখায়,
বৃষ্টি পড়ে সাগর জলে
মিষ্টি মধুর হাওয়ার তালে ।।
বৃষ্টি পড়ে গাছের ডগায়
বিল পাথার আর ঝিলের ডোবায়,
টাপুস টুপুস বৃষ্টি পড়ে
মন ছুটে যায় অচিন পুরে ।।
বৃষ্টি পড়ে সবুজ মাঠে
আঙ্গিনা আর পুকুর ঘাটে,
বিকেল বেলার বৃষ্টি ঝড়ে
মন ছুটে যায় তেপান্তরে ।।

স্বপ্নের অপমৃত্যু : আমাদের করণীয়

প্রভাষক আফরিন সাদিয়া রুমানা
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্
ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ

কেস স্টাডি-১

সজলের (ছদ্মনাম) লক্ষ্য ছিল ডাক্তার হওয়া। ডাক্তার হয়ে মানুষের কল্যাণে আসাই তার জীবনের উদ্দেশ্য। এসএসসিতে গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়া ছেলেটি ভর্তি হয় একটি কলেজে। নতুন বন্ধুদের সঙ্গে তার খুব ভাব। এ যেন জীবনের নতুন আলো। বন্ধুদের মধ্যে তার সবচেয়ে বেশি ভালো বন্ধু হয়ে ওঠে অবন্তি। কারণ অবন্তিও ডাক্তার হতে চায়। দুজনের ইচ্ছে একই। তাই লক্ষ্য পূরণের জন্য দুজনই অব্যাহত পরিশ্রম করে চলে। ক্লাস শেষে লাইব্রেরি। তারপর কোচিং সেন্টার। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে হোমওয়ার্ক। এভাবেই তারা তাদের বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কলেজ ছুটি হলে প্রতিদিনের মতো আজও তারা লাইব্রেরিতে চলে যায়। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে কোচিং এ যাবার জন্য রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ায়। পেছন থেকে প্রতিযোগিতা করতে করতে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসে পিষে ফেলে সজল আর অবন্তিকে। রাস্তায় পড়ে থাকে তাদের মৃতদেহ। মৃতদেহের পাশে ছিটকে পড়ে আছে তাদের বইয়ের ব্যাগ, পানির বোতল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দুজন হবু ডাক্তারের করুণ মৃত্যু। বাবা-মায়ের কোল খালি করে দিলো ঘাতক বাস-বাসড্রাইভার।

কেস স্টাডি-২

সুকন্যার (ছদ্মনাম) যেদিন জন্ম হলো, যেদিন মেয়েটা তার মা'র কোলজুড়ে এলো, সেদিন আকাশে ছিল না কোনো মেঘ। সাদা মেঘ ভাসতে ভাসতে কোথায় গেল চলে অন্য কোনো দূর দেশে। গোলাপের গাছে ফুটেছে একজোড়া লাল গোলাপ। তার ঘ্রাণ এসে পৌঁছায় বাবার নাকে। বাবা বলে দেখেছো, আমার সুকন্যা কত ভাগ্যবান। মেয়েকে নিয়ে মনের মধ্যে কত কী দানা বাঁধতে থাকে। আচ্ছা, আমাদের মেয়ে কি ডাক্তার হবে, নাকি ইঞ্জিনিয়ার। ভাবতে ভাবতে তার বাবার সময় পার হয়ে যায়। সুকন্যার মা'র এসব চিন্তা নেই। তার চিন্তা মেয়ে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক। দেখতে দেখতে মেয়ের বয়স এক বছর হয়ে গেল। সেদিন আনুমানিক সকাল এগারোটার দিকে মেয়েকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন তার মা। কোনো হর্ন না দিয়ে বাস পেছনে এসে ধাক্কা মারে। সুকন্যা রাস্তায় ছিটকে পড়ে। তার মৃত্যু হয় সেখানেই। বাবার কোলে করে আর চাঁদ মামাকে ডাকা হলো না। বাবাই তাকে কোলে করে শুইয়ে দিলেন কবরে।

কেস স্টাডি-৩

সকালে এক মুঠো পান্তাভাত আর আলুভর্তা খেয়ে ফরহাদকে (ছদ্মনাম) কাজে বেরিয়ে পড়তে হয়। তার বসে থাকলে চলে না। তাকে পরিশ্রম করতে হয় তিনগুণ। মাতৃ-পিতৃহীন ফরহাদের জীবনে কোনো বিশ্রাম নেই। বিশ্রাম করলে তার চলে না। নিজের পড়াশোনার খরচের পাশাপাশি ছোট দুই ভাইয়ের খরচও চালাতে হয় তাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা কম্পিউটারের দোকানে টাইপ করতে হয়। সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত পর্যন্ত টিউশন। তারপর ফিরে এসে ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিলে চলে না। তাকে নিজের পড়া শেষ করতে হয়। ঢাকার একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজের উদ্দেশ্যে। বাসে সিট নেই দাঁড়িয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। বিপরীত দিক থেকে আসা বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় তার একটি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রক্তে পুরো শরীর লাল হয়ে যায়। জ্ঞান হারায় সে। তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার একদিনের মাথায় হাসপাতাল ছাড়তে হয় টাকার অভাবে। দ্বিতীয় দিনের মাথায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যু হয় ফরহাদের। সেই সঙ্গে স্বপ্নের অপমৃত্যু হয় আরও দুজনের।

এ রকম হাজারও স্বপ্ন অকালেই ঝরে যায় এদেশে। কারা দায়ী এর জন্য? এক জরিপে দেখা যায় ৯১ শতাংশ গাড়ি জেব্রা ক্রসিংয়ে অবস্থানরত পথচারীদের আমলেই নেয় না। পাশাপাশি ৮৫ ভাগ পথচারী নিয়ম ভেঙে রাস্তা পার হয়। তাছাড়া এক

সমীক্ষায় বলা হয় ঢাকা শহরের ৮৪ শতাংশ রিকশাচালক ট্রাফিক আইন ও নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে অহরহ। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যানবাহনের সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজধানী ঢাকায়। বর্তমানে প্রতি কিলোমিটারে ২৪৭টির বেশি গাড়ি চলে। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আওতাধীন মোট ২২৩.৩০ কিলোমিটার রাস্তায় আধুনিক গাড়ি চলে ৫ লাখ ৫০ হাজার। অন্যান্য বড়ো শহরেও অনেকটা একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ফলে দুর্ঘটনার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনার অন্যান্য কারণ হিসেবে বলা যায়, চালকের বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং লাইসেন্স ও ফিটনেসবিহীন যানবাহনের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি, সংকীর্ণ ও আঁকাবাঁকা রাস্তা, হকারদের ফুটপাত দখল ও চালকের নিয়ন্ত্রণ হারানো। এছাড়া রাস্তা পারাপারে অসচেতনতা, অপরিকল্পিত স্পিড ব্রেকার, ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করা ও যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

সরকারের করণীয়-

এ ক্ষেত্রে সরকারের করণীয় ফিটনেসবিহীন গাড়ি রাস্তায় চলাচলের অনুমতি না দেওয়া। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের লাইসেন্স না দেওয়া। যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করলে শাস্তিসহ জরিমানা করা। ফুটপাত হকারদের হাত থেকে মুক্ত করা। পরিকল্পিতভাবে স্পিড ব্রেকার বানানো এবং সেগুলো যথাযথভাবে সাদা রং করা যাতে দূর থেকে একজন চালক পরিষ্কারভাবে দেখতে পান। রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে অবশ্যই ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার করা। নিয়ম-কানুন মেনে গাড়ি না চালালে কিংবা রাস্তায় অন্য যানবাহনের সঙ্গে কোনো রকম প্রতিযোগিতা, ওভারটেকিং, ওভারস্পিড করলে তার লাইসেন্স নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাতিল অথবা শাস্তির ব্যবস্থা করা।

চালকদের করণীয়-

চালককে প্রথমেই মানুষের জীবনের মূল্যের কথা ভাবতে হবে। দক্ষ চালক বা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে ড্রাইভিং এর উপর শিক্ষা নিতে হবে। গাড়ি চালানোর নিয়ম-কানুন মেনে গাড়ি চালাতে হবে। স্পিড ব্রেকার, ওভারস্পিড, ওভারটেকিং থেকে বিরত থাকতে হবে। সেই সঙ্গে মানুষের জানমালের হেফাজত করার মন মানসিকতা থাকতে হবে।

আমাদের করণীয়-

একজন ব্যক্তিকে প্রথমেই ভাবতে হবে তার নিজের জীবনের কথা। তাই সর্বোচ্চ বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে নিজেকে রক্ষা করবে। আশেপাশের মানুষকেও সচেতন করে তুলতে হবে। সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। এ কথাটি মনে রেখে রাস্তায় চলাচল করতে হবে।

সংগ্রাম হতে স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মেজর তানভীর হোসেন, পিএসসি
কাউন্সিলিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেন্টার (সিপিসি)

বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় সূচিত হয়েছে গণমানুষের সংগ্রামের মাধ্যমে। এদেশের অভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে, বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। দীর্ঘ নয় মাসের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম লাভ করেছে আমাদের মাতৃভূমি প্রিয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হলো ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা সংগ্রাম যা ছিল বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও নেই। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের মধ্যে সর্ব প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটাতে সক্ষম হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট গঠিত পাকিস্তান সৃষ্টির শুরুতেই দেখা দেয় ভাষা সমস্যা। মূলতঃ পাকিস্তান ছিল কয়েকটি প্রদেশের সমষ্টি। ফলে কোন একক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়টি ছিল অযৌক্তিক। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে পশ্চিমা স্বার্থান্বেষী মহল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ২৯ জুলাই, ১৯৪৭ "পাকিস্তানের ভাষা সমস্যাঃ শিরোনামে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখেন, "যদি বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তিই নেই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয় তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।" এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০% লোকের মাতৃভাষা ছিল বাংলা এবং মাত্র ৩.২৭% লোকের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। ১৯৪৭ সালে জুন মাসে মুসলিম লীগের কিছু সদস্য "গণ আজাদী লীগ" নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে তার ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখ করে "মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে" এবং "বাংলা আমাদের মাতৃভাষা"। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা সংগ্রামের সূত্রপাত হয়।

কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন । কিন্তু ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা বলে ঘোষণা করেন, যা জনরোষের সৃষ্টি করে। বাংলাকে অন্যতম সরকারি ভাষা করার দাবিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এরপর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি সর্বজনীন রূপ লাভ করে। তবে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন কমলেও ১৯৪৮ সালে ২০ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাদানকালে 'উর্দু এবং কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা' ঘোষণা করলে ভাষা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ লাভ করে।

১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পূনরায় 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা দিলে বাঙালি ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ভাষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ১৯৫২ সালে মাওলানা ভাষানীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার সব দল ও সংগঠনের সমন্বয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ' নামে একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন ও দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই ঐতিহাসিক কর্মসূচীকে নস্যাৎ করার জন্য তৎকালীন গভর্নর নুরুল আমীন ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করে। কিন্তু ভাষা সংগ্রাম পরিষদ এই নিষেধ অমান্য করে মিছিল বের করলে পুলিশের সাথে ছাত্র-জনতার এক মারাত্মক সংঘর্ষে শহীদ হন রফিক, জব্বার, বরকত, সালামসহ আরো অনেকে এবং বহু লোক আহত হন। এই ঘটনার পর সারা বাংলায় আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে একীভূত হয়ে পড়ে এবং একটি জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এর ফলে জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্খা বহুগুণে বেড়ে যায় এবং বাঙালি জাতিকে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়তা করে।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম রাজনৈতিক ফসল হলো ২১ শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন। এই ঐতিহাসিক মিছিলের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হতাহতের ঘটনার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়। এর ফলে বাঙালি জাতি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হয়।

১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, গণতান্ত্রিক দলসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশ নিয়ে ২৩৭ টি আসনের মধ্যে ২২৮ টিতেই জয়লাভ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল মূলতঃ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন। পরবর্তীতে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হয়। ১৯৫৪ সালে আইন পরিষদের অধিবেশনে মুসলিম লীগও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেয়।

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। ১৯৫৪ সালে প্রথম আইন পরিষদে গৃহীত ফর্মূলা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সংবিধানের ২১৪(১) নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এরই সাথে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজিকে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য সরকারি ভাষা হিসেবে চালু রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসব ঘটনাবলীর মাধ্যমে বাঙালিরা আশা করেছিল যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তদানিন্তন পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্র শ্রদ্ধাশীল হবে। কিন্তু আদতেই দেখা গেল যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৯৫৮ সালের জেনারেল আইয়ুব খান এক উচ্চাভিলাসী উদ্যোগ নেন। তিনি এক ধর্ম এক ভাষা এবং এক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে একটি 'নতুন জাতি' গঠনের প্রয়াস চালান। আইয়ুব খান এর পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা ও উর্দুর সমন্বয়ে রোমান হরফে লিখিত একটি ভাষা প্রচলনের চেষ্টাও করা হয় শুধুমাত্র বাংলা ভাষাকে অবদমনের জন্য। এর ফলে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার প্রচলন বারবার বাধার সম্মুখীন হয়।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালি জাতিকে চরমভাবে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলে দেয়। পাকিস্তানের সামগ্রিক রণকৌশলের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার মতো যথেষ্ট সামরিক ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি এখানে ছিল না। তাই এই যুদ্ধের শেষে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬৬ সালে লাহোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি ৬ দফাকে জাতীয় মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে। ৬ দফার মূল দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

ক। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পূর্বক পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে আইন সভা সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করবে এবং সকল প্রকার নির্বাচন প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হবে।

খ। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ক্ষমতা থাকবে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

গ। মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে দুটি বিকল্প পন্থার উল্লেখ করা হয়ঃ

(১) পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) জন্য পৃথক অথচ সহজে বিনিময় যোগ্য মুদ্রা প্রচলিত হবে এবং উভয়ের জন্য স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে। মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের কাছে।

অথবা

(২) দুই অঞ্চলে একই মুদ্রা প্রচলিত হবে। এ ক্ষেত্রে সংবিধানে বিধান রাখা হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা যেন অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে। এজন্য রিজার্ভ ব্যাংক এবং দুটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে।

ঘ। সকল প্রকার ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের কাছে। প্রাদেশিক সরকারের আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এজন্য সংবিধানে রিজার্ভ ব্যাংক বিষয়ক বিধান থাকবে।

ঙ। বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বানিজ্য বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকবে। সব ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রাদেশিক সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

চ। আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে অঙ্গরাজ্যগুলোকে তাদের কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালনার ক্ষমতা দেয়া হবে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ৬ দফাভিত্তিক আন্দোলনকে ক্রমেই গতিশীল করে তোলে। ১৯৬৮-৬৯ সালে ৬ দফা কর্মসূচী চূড়ান্ত গতি লাভ করে। ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলন এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলন একত্রিত হয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান ঘটে এবং আইয়ুব খান সরকারের পতন হয়।

১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের পরপরই তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করেন। সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৬৯টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নানা রকম ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহা জানায়। এর প্রেক্ষাপটে ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সালে মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ইতিহাসের জঘন্যতম ও বর্বরোচিত হামলা চালায়। বাঙালি মুক্তি বাহিনী এই হামলাকে রুখে দিতে সমর্থ হয়। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বিকালে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক নতুন একটি দেশের জন্ম হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার উৎপত্তি হয় মূলতঃ ১৯৫২ সালের ভাষা ভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে। ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের মনে যে চেতনা ও ঐক্যের উন্মেষ ঘটায় তা পরবর্তীতে সকল আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়, ১৯৬৬ সালের স্বাধিকার আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতার পথকে প্রশস্ত করেছে ভাষা সংগ্রাম। বাংলাদেশের এই সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতার ইতিহাস পৃথিবীর বুকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মাতৃভাষার জন্য বিরল এই সংগ্রামকে সম্মান ও স্বীকৃতি জানাতে ভাষা আন্দোলনের দিনটি অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (International Mother Language Day)" হিসেবে UNESCO স্বীকৃতি দান করেছে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে দিনটিকে উদযাপন করা হয় যা বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে সম্মানের আসন দান করেছে।

In search of light

Ridwana Islam Ruhama
Department of English, Session : 2018-19

The sky is plunged into darkness
I found no light;
Wandering here and there
Moon out of sight.
Darkness is all that's visible
None to see the right
How long is the way
The day's to be bright?

Darkness is straight heartbeat line
In mother's womb,
Darkness screams in red painted roads
In blasts of bomb.
Darkness is black and white zebracrossing
Turning blackish red,
Darkness is baby dying mistreated
On white bed.
Darkness is burning of fresh flesh
In blazing Inferno,
Darkness is scathel food of all types
That we know.
Darkness is rape of female
From infant to old,
Darkness is killing of mother
In rumours told.
Darkness is dirty mentality
That they have,
Darkness is inhumanity
Buried in grave.
Darkness is all around
Wherever looked;
Wish to see a ray of light
Now that's all hoped.

আমার বই পড়ার গল্প

নাঈমুম সাকিব
ডিপার্টমেন্ট অব 'ল', শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-১৮

আমাদের সময় প্রাইমারি স্কুলে গল্পের বই পড়ানো হতো। সরকার কর্তৃক নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছিল (দুর্ভাগ্যবশতঃ নিয়মটি বেশি বছর এগোই নি), সুন্দর মলাটে, রঙ্গিন ছবির শিক্ষামূলক গল্পের বই আমাদের বাধ্যতামূলক পড়ানো হতো। প্রতি বুধবার এই গল্পের বই পড়ার সুযোগ থাকতো। আমরা পড়তাম আর শ্রেণি শিক্ষক আমাদের ডেকে এনে কী বুঝেছি সেটা গোটা ক্লাসের সামনে বলাতেন। আমার একটা গুণ/অ-গুণ অতি সহজে যে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারার। ওই সময়ে অন্যদের তুলনায় খুব পিচ্চিটাইপ ছিলাম; কিন্তু কথার ঝাঁঝ অন্যদের থেকে বেশি ছিল। এজন্যে শিক্ষকদের দৃষ্টিগোচর হতে বেশি সময় লাগেনি। আমার এক পছন্দের শিক্ষিকা ছিল নাম মনে পড়ছে না এখন, গণিত করাতেন। উনি ২০ নাম্বারের পরীক্ষা নিলেন; তাতে আমি সম্ভবত কম পেয়েছিলাম। আমাকে বলেছিলেন ক্লাসে এত পাকনামি করো নাম্বার কেন কম পেলে? ওই বয়সে পাকনামি প্রশংসামূলক শব্দ কিনা বুঝতেই পারিনি। উনি আমাদের বুধবারের সেই গল্প পড়ার ক্লাসটাতে এলেন, আমাকে ডেকে এনে জোরে জোরে গল্প পড়তে বললেন যেন সকলে শুনতে পায় ও বুঝতে পারে। পড়ে শুনানোর পর আমার থেকে সারকথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি কী একটা উদাহরণ দিয়ে তাকে বুঝালাম এবং তালি দিয়ে উঠলেন। উনাকে দেখাদেখি সকলে তালি দিয়ে উঠলো। তিনি বললেন আমি নাকি গল্পটা খুব ভালোভাবে পড়েছি বিধায় এত সুন্দর করে বুঝাতে পেরেছি!

হাইস্কুলে পা রাখলাম। সরকারি স্কুল, রীতিমত বাদরামি করতাম; তবে তালে তালে বই পড়ার নেশা পেয়ে বসলো। শুরুটা হয়েছে সেবার তিন গোয়েন্দা দিয়ে। তিন গোয়েন্দা পড়ারও একটা মজার কাহিনী আছে। একটা বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম, বৃত্তি পাওয়ায় প্রাইজবন্ড ও রঙিন মোড়কে বই উপহারস্বরূপ দেয়া হলো। বাসায় যেয়ে মোড়ক খুলতেই বেরিয়ে আসে তিন গোয়েন্দা! প্রথমেই পড়া শুরু করি নি, কয়েকদিন পর ধরলাম। যেদিন ধরলাম সেদিন আমি আর অন্যকিছু করতেই পারি নি। নাওয়া খাওয়া ভুলে বইয়ে ডুবে গেলাম। সেই থেকে শুরু। পুরাতন বইয়ের দোকান থেকে বই ভাড়ায় এনে নতুবা নতুন কিনে বিক্রি করে পুরাতন থেকে কিনা এসব লেগেই ছিল। এরপর এলো মাসুদ রানা। তিন গোয়েন্দার মত মাসুদ রানাও গিলতে শুরু করলাম। একটা বন্ধু মহল তৈরি হয়ে গিয়েছিল সবার বই পড়া নিয়ে। মাধ্যমিক এভাবেই কেটে গেছে সবার সান্নিধ্যে।

তবে বই পড়া আমার জন্য সুখকর ছিল না। অনেক চালাকি করে বই পড়তে হতো। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরানার পরিবারে বেড়ে উঠা তো, তাই বাহ্যিক বই পড়ার বিলাসিতার ঝুঁকি নিতে দিতে চাইতেন না। ওই সময় আমাদের বলা হতো, আমাদের কাজ শুধু "পড়া (একাডেমিক) আর খাওয়া"। তাই ছলছাতুরি করে বই পড়তাম। কখনো বাথরুমে আধা ঘন্টার মতন থেকে, টেবিলে পাঠ্যবইয়ের নিচে রেখে কিংবা আব্বু আম্মু অফিসে চলে গেলে খাটে শুয়ে শুয়ে। স্কুলে যাওয়ার পথেও আঁতেলদের মত করে বই গিলতাম। একটা কাহিনী মনে পড়ে গেলো, আমি তখন ক্লাস এইটে। মারিও পুজোর গডফাদার এর বাংলা অনুবাদ পড়ছিলাম বাসে স্কুলে যেতে যেতে। আমি তখনো গোলগাল ছিলাম এবং অন্যান্যদের তুলনায় ছোট টাইপ, এরকম আমার মত এক ছেলের হাতে "গডফাদার" নামক সন্ত্রাসী টাইপ বই মেনে নিতে পারেননি এক যাত্রী। আমার সিটের পাশেই উনি দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন, তার পরিচিত অপর এক যাত্রীকে কথা প্রসঙ্গে বললেন এখনকার ছেলেপেলেরা নাকি বেয়াদব কিসিমের হয়ে গেছে, তারা মোটেও পড়ালেখার সাথে নাই, সারাদিন আজেবাজে বই আর সাইবার-ক্যাফেতে যেয়ে দিন কাটায়! আমি নিশ্চিত ছিলাম আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা তাই কিঞ্চিত লজ্জা পেলাম; আর গন্তব্যের ঠিক খানিকটা আগেই নেমে গেলাম।

মাধ্যমিক পরীক্ষার পর নিজেকে পুরোদস্তর বেটাছেলে মনে হতে লাগলো। গুগলে খোঁজ লাগালাম বাংলা সাহিত্যের সেরা উপন্যাস নিয়ে। লিস্ট অনেক বড়ো, অত পয়সাও নেই যে একা সব কিনতে পারবো যেহেতু বাসায় বলে লাভ হবে না। কয়েকটা নেয়া শুরু করলাম। অবশ্যই পুরাতন বই। নতুন বই নেয়া তখন বোকামি মনে হতো। এরপর খোঁজ লাগালাম ইংরেজিতে, লিস্ট করে কয়েকটা বই নিলাম। কেয়ারীর "পাঠশালা" দোকানটায় কম দামে নীলক্ষেত প্রিন্টের পেয়ে যেতাম, পড়তাম। কষ্ট হলেও ডিকশনারি পাশে রেখে পড়তাম। অরওয়েলের অ্যানিমেল ফার্ম পড়েছি শুনে এক ভার্সিটি পড়ুয়া ভাইয়া তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন নিজেকে খুব বড় কিছু ভাবতাম, আগ বাড়ায়ে বইয়ের সারকথা শুনাতে লাগলাম। উনি আরো অবাক হলেন, এবং প্রশংসাও করলেন। কলেজের শুরুর সময় প্রশংসা পেতে খুব ভালো লাগতো। ফেসবুক খুলে টুকটাক লিখার চেষ্টা করতাম। বই সম্পর্কে লিখে পন্ডিতি জাহির করার চেষ্টা করতাম।

এখন পণ্ডিতি জাহির করা আরো সহজ ও সুন্দর হয়ে গেছে "গুডরীডস" এর কল্যাণে। তবে সত্যি বলতে এখন পর্যন্ত ৫০০টা বইও পড়া হয় নি অথচ এই পুরো লেখা পড়ে আপনি ভেবেছেন আমি অনেক বড় বোদ্ধা টাইপ কিছু। এভাবে লেখার কারণ হলো নিজের প্রতি তাড়না বাড়ানো। এই লেখার ফলেই আমি নতুন করে আরো কয়েকটা বই পড়ার স্পৃহা পাবো। বই পড়া হুট করেই আসে না। একটা জোর লাগে, সেই জোর কে কীভাবে ম্যানেজ করে সেটা তার ব্যাপার। কিন্তু আমার এই লেখা আমার বই পড়ার দায়।

অবিনশ্বর

সৈয়দ খালিদ আসফাক রুমি
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন মার্কেটিং, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-১৮

আবহমানকাল ধরে এই নগরীতে
বয়ে চলেছে এক ধ্বংসের নদী,
ক্লিওপেট্রা অথবা হেলেন যেখানে
এক-একজন দিশেহারা নাবিক;
মিশর কিংবা ট্রয় তাদের গন্তব্য
পাবে কি তারা খুঁজে পথ?
ধ্বংসের সেই সম্মুখে যেতে আবার;
একদিন, সেই পথের সূচনালগ্নে
যাওয়ার বৃথা চেষ্টায়,
হয়তো বিলীন হবে তারা উত্তাল প্লাবনে।
হারিয়ে যাক, তবু ধ্বংস বন্ধ হোক
স্তব্ধ হোক সমস্ত কোলাহল।
তারপর,
তারপর এক জলোচ্ছ্বাস উঠবে
সৃষ্টির সমুদ্রে।
শুধুই অপেক্ষা......

প্রিয়তমেষু : বই

সাবাহ্ মেহজাবিন সরওয়ার
অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক), চিফ প্ল্যানি, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস

Tsundoku একটি জাপানি শব্দ। এটা দ্বারা একটি অভ্যাস বুঝায়। যার ফলে ব্যক্তি বই কিনেন বা সংগ্রহ করেন কিন্তু পড়েন না। বই এর অনুরাগীদের যদি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা- পাঠক, অপাঠক, তবে Tsundoku তে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অবশ্যই উক্ত দুই শ্রেণির সংকর এবং সেতুবন্ধন রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। আমি প্রায়ই দ্বিধায় পড়ে যাই আমি প্রকৃতপক্ষে কোন গোত্রের লোক। স্থান, কাল ও বিষয়ভেদে আমি বিভিন্ন সময় তিন গোত্রেই পড়ছি। নিজ বিবেচনায় আমি যতবারই নিজের বুদ্ধিতে নতুন বই কেনার চেষ্টা করেছি, তার ফলাফল কখনো খুব আশানুরূপ হয়নি এবং পড়াও হয়নি। ক্ষেত্র বিশেষে আমি Tsundoku গ্রস্থ হলেও আমি ক্ষুদ্র জীবনে চমৎকার কিছু বইয়ের সন্ধান পেয়েছি। সবচেয়ে পছন্দের ৩টি বই এর নাম বলা নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ। সেই দুঃসাহস দেখাব না। তবে চমৎকার তিনটি বইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়াস আজ নিব।

(ক) গোরা: সমাজ ব্যক্তির চারপাশে নানান পরিচয়ের বলয় গড়ে তোলে। জাতিসত্ত্বা হোক বা ধর্ম-গোত্র, এ সকল পরিচয় এর সংঘর্ষ অনেক সময় অনিবার্য হয়ে উঠে। সেই সংঘর্ষে ব্যক্তির মনোজগতে উঠা সায়মুম ঝড়ের চিত্র শব্দে গ্রথিত হয়ে গদ্য রূপে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গোরা উপন্যাসে। জন্মগত পরিচয় ও সামাজিক পরিচয়ের সংঘাত এই উপন্যাসের মূখ্য বিষয়। ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার কাছে বেড়ে উঠা গোড়া কট্টর ও প্রবলভাবে বর্ণ সচেতন এবং ভারতবর্ষের জন্য নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি। ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের মানুষকে প্রবলভাবে আপন করে নিয়েছিল গোরা। কিন্তু এক পর্যায়ে গোরা জানতে পারে, তার প্রকৃত পরিচয়। ফলে সযত্নে আজীবন লালিত প্রবল বিশ্বাসে ও গর্বে চিড় ধরে। জন্মগত পরিচয়-বিশ্বাস বনাম সামাজিক পরিচয়ের সংঘাত এর মধ্যে কাকে জয়ী করেছেন কবিগুরু তা জানতে হলে পড়তে হবে গোরা উপন্যাসটি।

আরেকটি লক্ষণীয় দিক এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোর চিন্তা ও যুক্তির বিচারের ব্যাখ্যা। চরিত্রগুলো বিকাশে এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপন্যাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার নানা খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় বিশ্বকবির বর্ণনায়। চরিত্রগুলোর গভীরতা পাঠকের ভাল লাগবে। উপন্যাসের চরিত্রগুলো বটবৃক্ষের ন্যায় বেড়ে উঠেছে আপন মহিমায় ও গুণে। কট্টরপন্থী গোরা, মানবতাবাদী বিনয়, অভিমানী ললিতা কিংবা হিমালয়ের মত বিশাল ব্যক্তিত্ব ও উদার পরেশ বাবু সকল চরিত্রগুলোর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যও লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন যত্ন সহকারে পুরো উপন্যাস জুড়ে।

চরিত্রগুলোর গঠনে আছে অভিনবত্ব, স্বকীয়তা। যেমন প্রাথমিকভাবে গোরাকে কূপমন্ডুক মনে হবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে গোরা চরিত্রের স্বরূপ নির্ধারণে পাঠককে বেগ পেতে হবে। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ ধীরে ধীরে একটা বলয় তৈরি করে গোরার চারপাশে যার মাধ্যমে গোরা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এমনকি লেখকের সৃষ্টিশীলতার পরিচয় আরো জোরদার করেছে হারানবাবুর মত চরিত্র। এত বিরক্তির উদ্রেক কেবল উপন্যাসের চরিত্র দ্বারা তৈরি, নিঃসন্দেহে দুরূহ ব্যাপার। এছাড়াও মুগ্ধ করে মানবতার গান গেয়ে যাওয়া আনন্দময়ীর, যিনি সকল ধর্ম ও পরিচয়ের উর্ধ্বে প্রাধান্য দিয়েছেন মাতৃধর্মকে।

মাত্র দু'টি পৃষ্ঠার চমকপ্রদ সমাপ্তির মাধ্যমে লেখক আলোকপাত করেছেন এক বিশাল সত্যের উপর, যার জন্য আয়োজন চলেছে পুরো উপন্যাস জুড়ে। সর্বোপরি আদর্শের সংঘাতের লড়াই প্রত্যক্ষ করা উপন্যাসের নির্মাণ শৈলীর নৈপুণ্য পরখ বা তৎকালীন সমাজচিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যে কোনো কারণেই গোরা একটি অবশ্যপাঠ্য উপন্যাস।

(খ) পুষ্প, বৃক্ষ, বিহঙ্গ পুরাণ: Conspiracy of silence বলতে বুঝায় ইচ্ছাকৃত নিরবতার মাধ্যমে কোন প্রতিভা যথাযথ আলোচিত বা প্রশংসিত হতে না দেয়া। আহমদ ছফা সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন শিল্পের, ব্যক্তির যথাযথ আলোচনা করে সেটা সকলের সামনে তুলে ধরতে। এই Conspiracy of silence এর শিকল ভাঙতে। তাঁর এই প্রচেষ্টার অনন্য উদাহরণ, এস. এম. সুলতানকে অবিরত তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু সকলের জন্য এই Conspiracy of silence ভাঙ্গার চেষ্টা

করতে গিয়ে তিনি নিজেই এর শিকার হয়েছেন কি না, এই প্রশ্ন আমার মনে আসে বার বার; যখন দেখি এই প্রজন্ম আহমদ ছফা পড়ছে না। কেন আহমদ ছফার সাহিত্য অবশ্য পাঠ্য তা বুঝতে হলে পড়তে হবে পুষ্প, বৃক্ষ ও বিহঙ্গ পুরাণ। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি বন্দনা আছে, তবে প্রকৃতিকে বোঝার, ভালবাসার প্রয়াস কম, যা আছে তার মধ্যে পুষ্প, বৃক্ষ, বিহঙ্গ পুরাণ অন্যতম।

এই বইয়ে লেখক তাঁর এমন এক সত্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, যে সত্ত্বা প্রকৃতিকে অনুভব করে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে। সেই সত্ত্বা প্রকৃতির একদম আটপৌরে নিতান্ত সাধারণ জিনিসপত্রকে অসামান্য রূপে তুলে ধরেছেন। গাছে নতুন ফুল আসার আনন্দ, গাছ এর স্বাস্থ্য ভগ্ন হলে তার বেদনা এর মত ছোট্ট ঘটনার, মানব মনের উপর বিস্তর প্রভাব উঠে এসেছে সরল ও সাবলীল ভাষায়। ইট-পাথরের ঠাসা এ শহরে সকলের মধ্যেই যে এক চাষী প্রবৃত্তি লুকানো আছে তা খুঁজে বের করেছেন আহমদ ছফা এই গ্রন্থে। লেখক হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উদ্ভিদ, বিরুৎকূলকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। কখনো দেখেছেন শিশু হিসেবে, কখনো এর সৌন্দর্য লেখকের চোখে ধরা দিয়েছে নারীর মত। কোন কিছুকে ভালবাসলে, উদ্ভিদের মত নির্বাক বস্তুকেও যে উপলব্ধি করা যায়, তার সৌন্দর্য পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হয় আমাদের সামনে সেই প্রমাণ আছে পুরো বইতে উপযুক্ত প্রমাণ ও উপমার সাথে নানান সময়ে পাখিদের সঙ্গী ছিলেন ছফা। তার ভীষণ ভালবাসার পাখি পুত্রের প্রসঙ্গ এসেছে ঘটনায় ও কাহিনীতেই। তখন লেখকের জীবনীতে এসেছে সেই ঘটনায় প্রাপ্ত মানব জীবনের এক চরম মহাসত্য-একমাত্র অন্যকে মুক্ত করেই মানুষ নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারে।

তবে এই বইকে লেখকের ও গাছের নিতান্ত রসকসহীন বোঝাপড়া বললে ভুল হবে। এখানে পুরো কাহিনীতেই লেখকের রসাত্মবোধ আপনাকে হাসাবে। আক্ষেপ করাবে বইটা এত অল্প পরিসরে শেষ হওয়ার জন্য।

লেখকের অন্যতম গুণ তিনি লেখনী ও মায়া একসূত্রে গেঁথে সবকিছুকে মায়ার জালে আটকে ফেলেন। এই গ্রন্থে মায়ামাখা বর্ণনা এসেছে পুষ্প, বৃক্ষ আর বিহঙ্গের। আমাদের মনের অন্তরালে যে সকল ছোট ছোট আনন্দ বেদনা উপেক্ষিত হয়ে যায়, তাদেরকে লেখনীর মাধ্যমে সামনে তুলে ধরার এত সার্থক প্রয়াস বড়ই বিরল। সর্বোপরি, সবুজের মোড়কে অসীম মমতায় মোড়া প্রকৃতিকে বোঝার ও ভালবাসার এক অনন্য গল্প পুষ্প, বৃক্ষ ও বিহঙ্গ পুরাণ।

(গ) Rich Dad Poor Dad: পূর্বের আলোচনা করা দুটি বই থেকে এই বইটির ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই বই এর আলোচ্য বিষয়- আমাদের চিন্তার ধরন অর্থ ও বিত্তবানদের প্রতি আমাদের ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিনিয়োগের ধারণা। তবে বইটি অবশ্যই finance এর জটিল তত্ত্ব, বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করে না। বইটির লক্ষ্য সফল ব্যবসায়ী তৈরি নয়, বরং প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলভাবে Financial Management করতে শেখানো।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা Robert Kiyosaki এবং Sharon Lechter রচিত এই বইটি দেওয়ার চেষ্টা করে তা হলো উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই বিত্তবান নয়। ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, উচ্চতর ডিগ্রি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সম্পদ আহরণের তবে একমাত্র উপরকরণ নয়। অথচ কিনা, আমরা ছোটবেলা থেকেই শিখে এসেছি, “লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।” তাহলে সম্পদশালী হওয়ার রহস্য কি? সে রহস্য উন্মোচনের ব্যক্তিগত পর্যায়ের কার্যকর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে বইটি। লেখক ব্যাখ্যা করেছেন বিত্তবান ও মধ্যবিত্তদের মধ্যের পার্থক্য যে শুধুমাত্র Financial Management. তিনি দেখিয়েছেন বিত্তবানরা Asset ক্রয় করে যা কিনা সম্পদকে বিবর্ধন করে আর মধ্যবিত্তরা ক্রয় করে liability। বইটি নতুন করে ভাবতে শিখবে কোন বস্তু প্রকৃতপক্ষে Asset এবং কোন বস্তু আমাদের liability.

তবে, এই বইয়ের সবচেয়ে স্বার্থক দিক হল অর্থের স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ। অর্থের পিছে দৌঁড়ানো বৃথা, সঠিক চিন্তা ও কাজের সমন্বয় ঘটলে যে অর্থের সমাগম অবধারিত তার উপর বিস্তর প্রমাণসহ আলোচনা করা হয়েছে এই বইতে।

আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অর্থ ও Financial Management নিয়ে কিছু শিখানো হয় না। যার ফলে অধিকাংশ মানুষ অর্থের জন্য কাজ করে। কিন্তু, অর্থকে নিজের জন্য কাজ করাতে পারে না। তাই, অর্থের গতিপ্রকৃতি ও ধর্ম বুঝে অর্থকে নিজের জন্য খাটাতে হলে বইটি পড়া উচিত সকলের।

Military in Higher Education

Prof Maj Gen Mohammad Quamruzzaman (Retd)
Adjunct Professor, Faculty of Business Studies (FBS)

Introduction

Higher or tertiary education means the education for an adult in the college or university at graduate and post graduate levels after completion of higher secondary education. Latin *'universitas magistrorum et scholarium'* denotes a university as the community of teachers and scholars irrespective of one's background: science or business, medical or engineering, music or astronomy, humanities or polemology.

Polemology, a multi-disciplinary war studies, dominated the arena of higher education. Ramayana, Mahabharata, Iliad, Odyssey, Theogony, and such others depict wars which are the primary sources of various -logy, -ism, -gony, -ics, -gogy, -sophy in higher education. Conversations of Bhagwan Krishna with Arjun at Kurukshetra is Bhagavad Gita. Hesiod's Theogony is Gods' and Goddesses' war as Titans and Olympiads.

Military in Higher Education

Civilians become military and vice-versa on human needs. Pythagoras' researches were aimed for victory of Croton over Sybaris in 510 BC. Socrates, a military officer coined Philosophy; Greek 'Phil' is love, 'Sophia' is wisdom. Epistemology, knowledge about knowledge confirms that philosophies were founded from fighting needs to survive and sustain; against deities, rivals, animals, diseases, and calamities. Plato and Aristotle provided philosophical solutions to universal problems.

Academy etymologically came from Greek *Academus* who saved Athens outwitting rivals. Strategy, a capstone course in business, comes from Greek *'strategia'* - the generalship in war. Shakespeare's and Tagore's famous characters are war heroes and/or victims. Sun Tzu, Chanakya, Machiavelli, World Wars (WW) I, II gave rise to many higher education subjects studied in present day universities in multifarious fields.

Tolstoy's 'War and Peace', a historical novel depicts Napoleonic era on Tsarist society. United Nations (UN) establishment is the consequence of war between the World's Axis versus Allied forces. UN University functions at Tokyo since 1973 as a think tank and research centre to prevent wars. Australian Monash University was named after General Monash who fought in the Gallipoli campaign. He was also the Vice Chancellor of Melbourne University (1923-1931).

Lieutenant General Zameer Uddin Shah was the 38th Vice Chancellor of Aligarh Muslim University (2012-2017). He is the brother of noted Indian actor Naseer Uddin Shah. General David Petraeus is a Professor at Birmingham University in the Institute for Conflict, Cooperation and Security. US Presidents are the most important personalities to take care of higher education in USA and to influence others. Out of 44 US Presidents, 31 of them possessed military service background.

Winston Churchill, a Lieutenant Colonel during WW I became the Prime Minister of UK in WW

II. He got Nobel Prize (Literature) for his historical memoir on the Second World War. The ousted Indian Congress President of 1939 following differences with Congress High Command, Netaji Subhash Bose became a self-declared military General of Indian National Army (INA) against British Raj. In the consensus of scholarly opinion that 'war brings solution when politics fails'- history will decide Bose's epistemological intellect.

Netaji Subhash University of Technology, a public higher education centre in New Delhi holds the Motto "May God bring holy thoughts to my mind from all directions". Tertiary or higher education demands andragogy and heutagogy unlike pedagogy followed in lower levels of education. These relate teaching and learning of peda- (child), andra- (adult) and heuta- (self). Military provides due emphasis on heuristics; an approach to solve problems by oneself discovering/inventing the various ways and means. Heuristics employ empirical methods and rational approaches, for reaching an immediate solution in order to research further.

Military in Research and Innovation

Research is a regular affair of higher education which entails systematic and creative work to increase the stock of knowledge. The word Research comes from French 'recherche,' meaning to go about seeking for an answer to a question or a solution to a problem. The same is in rigorous practice among military intellects as R&D, an acronym of Research and Development. This is a part and parcel of any higher education institute in military organogram. Military environment ensures disciplining researchers' thought process by writing Appreciations and Estimates. Major Ronald Ross' research on malaria is a typical example.

Meta-research is a subject that studies research on research; how the research methodology to be carried out to reduce waste of time and resources on research itself. Research types: scientific, humanities, artistic, business, marketing, social, economic etc. differ from one another though basics remain the same. Young military learners learn these tips in their military academies to solve every day tactical and technical problems by: defining the problem, forming a hypothesis, gathering data, analyzing data, testing and interpreting, reaching to conclusion. Procrastinations may arise when statistical processes overshadow the main course of research process.

Conclusion

The role of military in higher education is significant and is as old as the history of education itself. Epics by Valmiki, Vyasa, Homer, Hesiod and other polymaths are the sources of all higher education subjects ending with -logy, -gogy, -ics, -ism, -gony, -sophy, etc. Epistemology identifies polemology to be the root of all knowledge; wars at Lanka, Kurukshetra, Troy, Titans, Olympiads, WW-I & II etc. Militarism against deities, rivals, animals, diseases, calamities gave gradual wisdom to Homo sapiens to survive and sustain.

Military professionals possess an advantageous position to excel in higher education due to historiographical legacy, organizational strengths and disciplined systems. Latin *universitas magistrorum et scholarium* denotes a university that welcomes tertiary knowledge seekers of any vocation. Polymaths Arjun, Pythagoras, Socrates, Academus, Napoleon, etc with military background paved the way for us to nurture higher education along with civilian intellects. No superiority in higher education; optimization is the way through civilianization and militarization on need basis.

আকাঙ্ক্ষিত বাংলা

সাদিক হাসান
ডিপার্টমেন্ট অব আইসিটি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯

নিউইয়র্কে আজকাল বেশিই ঠান্ডা পড়ছে, ঝিরিঝিরি তুষারপাত তো আছেই। ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে বাইরের বিবর্ণ দৃশ্যটি বেশ ভালো ভাবে উপভোগ করা যায়। আর তা সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল অ্যারিক। ভিন্ন রঙের গাড়িগুলোকে এক রঙে সাজানোর দায়িত্বটা যেন তুষার পাতের কাঁধেই পড়েছে। পাশে থেকে হঠাৎ করেই এক ইংরেজ মেয়ে বলে উঠলো, "আগামীকাল ভাষা দিবস উপলক্ষে লিটারেচার ক্লাবে অনুষ্ঠান হবে। আমরা অনেকেই অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তুই কি ইচ্ছুক?"

সবাই বলে আমার মধ্যে ইংরেজি বলার বাক ভঙ্গিমা কম, আমিও তা বুঝি। তো, এসব অনুষ্ঠান আমার জন্য না। কিছুক্ষণ পর ইংলিশ ম্যাম ক্লাসে এসে ভাষা দিবস সম্পর্কে বলছিলেন। এই দিবসটির উৎপত্তি নাকি বাংলাদেশে। ভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে বিরল ইতিহাস গড়েছেন "বাঙালি" নামক জাতি। আগে এই দিবসটি শুধু বাংলাদেশে পালিত হতো। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো দিবসটিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তারপর থেকে দিবসটি গোটা বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। আমি আগ্রহী হয়ে কথাগুলো শুনছিলাম। মনোযোগটা আরও বেড়ে গেল যখন ম্যাম বললেন, "আজ আমি তোমাদের কিছু বাংলা লেখা দেখাবো।"

লেখা গুলো দেখে আমি একটু বিস্মিত হচ্ছিলাম। কয়েকটা শব্দ বেশ চেনা চেনা লাগছিল। মনে হচ্ছিল এরকম লেখা আমি আগেও দেখেছি কোথাও, অনেক বার করে। কিন্তু কোথায় যে দেখেছি তা কিছুতেই মনে পড়ছিল না।

ক্লাসের ঘন্টা পড়ে যাওয়ায় ভাবনাগুলো উড়িয়ে দিয়ে বাসায় চলে গেলাম।

বিকেলে বারান্দায় বসেছিলাম, হঠাৎ করেই মনে হলো ম্যামের দেখানো বাংলা লেখাগুলোর মতো লেখা তো আমি বাপির রুমে দেখেছিলাম, যেটা মেঝেতে পড়ে ছিল। আর ওটা সম্ভবত চিঠির খামে ছিল। কিন্তু এ ধরনের ভাষায় লেখা চিঠি বাপির কাছে কীভাবে এসেছে?

ইতোমধ্যে, মাম্মি নাস্তা করার জন্য খাবার টেবিল থেকে ডাকলেন। উনি স্কুল, পড়াশোনা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। নিয়মিত পড়াশোনা করি বলেই যে, আমি ক্লাসের প্রথম সারির একজন ছাত্র তা মাম্মি আর বাপিকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিলাম। তারপর বললাম, "জানো তো, আজকে ক্লাসে একটা মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ভাষা রক্ষার্থে বাঙালি নামক জাতি নাকি প্রাণ দিয়েছিলেন এই দিনে। তারপর থেকেই এই দিবসটি পালিত হয়। ইতিহাসটা হৃদয়স্পর্শী, তাই না?"

আমার কথা শুনে বাপি-মাম্মি কেউই কোনো কথা বলছিলেন না। বরং, মাম্মি জোরে জোরে শব্দ করে নাস্তা সাজিয়ে দিচ্ছিলেন। আর বাপি আমার দিকে কেমন করে তাকিয়েছিলেন যেন এক অচেনা ভঙ্গিমায়। এতো মজার একটা কথা বললাম, অথচ তাদের থেকে কোন গুরুত্বই পেলাম না। তাই, মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল।

পরেরদিন স্কুলে যাওয়ার সময় অনেকেই লিটারেচার ক্লাবের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আলোচনা করছিল। অবচেতন মনের কিছু প্রশ্ন আপনা-আপনিই যেন আমাকে ভাবিয়ে তুললো। ম্যামের দেখানো লেখাগুলোর ধরন আর মেঝেতে পড়ে থাকা ঐ লেখাগুলোর ধরন একই। আবার গতরাতে বাংলা ভাষার কথা তুলতেই বাপি, মাম্মির অদ্ভুত আচরণ। কেন জানি না, আমি বিষয়টাকে কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারছি না। বার বার করে মাথায় ঘুরছে। আচ্ছা, এসবের মধ্যে কি কোন গোলযোগ বা যোগসূত্র থাকতে পারে?

আমার ভালো-মন্দ সব বিষয় সিঁথিতে লাল রং পড়া, শ্যাম বর্ণের, হাস্যজ্জ্বল পিয়ালী ম্যামের সাথে আলোচনা করি। উনি ইন্ডিয়ান। হিন্দি ও বাংলা ভাষায় ভালো দখল তার। নিত্যদিনের মতো আজও আমার ভাবনার বিষয়টি নির্দ্বিধায় তার সাথে শেয়ার করলাম। উনি বললেন, "তুমি ঐ চিঠি যোগাড়ের চেষ্টা কর। আমি ইংরেজি ম্যামের থেকে লেখাগুলো সংগ্রহ করবো।"

বাসায় গিয়ে ভাবলাম কিভাবে চিঠিটা যোগাড় করা যায়। চিঠিটা আমি বাপির কাগজ পত্রের বাক্সের কাছে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। তার মানে কি চিঠিটা ঐ বাক্সে রাখা ছিল? ঐ বাক্সে যদি রাখাও থাকে, আমি চাবিটা পাবই বা কী করে? বাপি যে রাগী মানুষ! আচ্ছা, বাপি তো কিছু দিন পর পর অপ্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র গুলো স্টোর রুমে রেখে দেন। আমি কি তাহলে

সেখানে খুঁজে দেখবো?
সবাই ঘুমিয়ে যাবার পর, গভীর রাতে স্টোর রুমে ঢুকে আমি বাপির পুরাতন কাগজপত্র গুলো খোঁজা শুরু করলাম। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর, অবশেষে একটা পুরনো কাগজ পেলাম। ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম, কাগজের লেখাগুলো বাংলা। কাগজটা ম্যামকে দেখাতে পারবো ভেবে, খুশিতে যেন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। আর এখানকার কিছু শব্দও আমার বেশ চেনা (বাংলা, মা, বাবা)। ম্যামের দেখানো ঐদিনের লেখাগুলোর মধ্যেও ছিল এগুলো।
পরের দিন দৌঁড়ে পিয়ালী ম্যামের কাছে চলে গেলাম। উনি চিঠিটা দেখছিলেন আর বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ পরে আমায় বললেন, "তোমায় প্রথম দেখার পর আমি কি বলেছিলাম, মনে আছে?"
আমি মনে করার চেষ্টা করছিলাম। মুহূর্তেই ম্যাম বলে উঠলেন, "তুমি দেখতে অনেকটা আমার দেশীয় মানুষের মতো। এটাই বলেছিলাম।"
আতঙ্কিত কিছু ঘটতে যাচ্ছে হয়তো, এটার আঁচ পেয়ে জড়সড় হয়ে বলে উঠলাম, "জ্বি। মনে আছে।"
আমি এখন তোমায় যে কথা গুলো বলবো মাথা ঠাণ্ডা করে শুনবে। অ্যারিক, তোমার ধারণাটা সঠিক। ম্যামের দেখানো শব্দ গুলো আর তোমার বাবার চিঠি দু'টোই বাংলা ভাষায় লেখা। খুব সম্ভবত তোমার দিদিমা চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন এবং এটা মূলত তোমায় উল্লেখ করেই লেখা। তোমায় যেন বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বাংলা ভাষা শেখানো হয় এই বিষয়ে তোমার বাপিকে তাড়া দেওয়া হয়েছে।
আমার ধারণাটা সঠিক হয়েছে বলে আমার খুশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমি কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, অশ্রুসজল চোখে ম্যামের দিকে তাকিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে শুনছিলাম তার কথা। আর ভাবছিলাম, "আমার দিদিমা কি বাঙালি? তাহলে আমার বাপিও তো বাঙালি। কি আশ্চর্য এগুলো আমাকে কখনোই জানানো হয়নি কেন!
আমার পূর্বপুরুষ যে বাঙালি এই সত্যটা আমার থেকে লুকিয়ে রাখার কারণটা কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না।"
নরম বচনে ম্যাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি এর আগে কোনোভাবেই এই ব্যাপারটা বুঝতে পারনি বা তোমাকে জানানো হয় নাই?"
প্রতিউত্তরে বললাম, "আমি কখনোই বাংলাদেশ বা বাংলা ভাষা সম্পর্কে জানতামই না। আর কেনই বা বাপি-মাম্মি আমার থেকে এই চরম সত্যটা লুকিয়ে রেখেছেন, এটাও বুঝতে পারছি না।"
ম্যাম শান্ত গলায় বললেন, "আমি নিজেও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। তবে, যেহেতু তোমাকে এই ব্যাপারে উনারা কিছুই বলেন নাই। হয়তো কোন রহস্য আছে। তোমারও হঠাৎ করে কিছু বলা ঠিক হবে না মনে হচ্ছে, সময় নেওয়া দরকার।"
আমি চুপচাপ বসে ভাবছিলাম আর বাপি-মাম্মির ওপর রাগ বেড়েই চলতেছিল।
আমায় অবাক করে ম্যাম বললেন, "যদিও তোমায় বাংলা সংস্কৃতি থেকে আলাদা রাখা হয়েছে তবুও বলতে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা, তোমার কি বাংলা শেখার কোন ইচ্ছে আছে?"
হঠাৎ করে কেমন যেন একটুখানি প্রশান্তি পেয়ে বললাম, "জ্বি, ম্যাম। আমি শিখতে চাই।"
তারপরের দায়িত্বটা যেন ম্যামের কাঁধে....
আমার মাঝে বাংলা ভাষার দখল গড়ে দিলেন ৭/৮ মাসেই। তন্মধ্যে আমি লুকিয়ে দিদিমার পাঠানো চিঠি গুলো পড়ে ফেলেছি। চিঠিগুলোতে বাপিকে বার বার দেশে যেতে বলা হয়েছে, আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু বাপির মাঝে তেমন কোন আগ্রহ আমি কখনোই দেখি নাই। বাপির কি বাংলা সংস্কৃতি অপছন্দ নাকি বাংলাদেশ? আর কেনই বা অপছন্দ? সেটা কি আমার ব্রিটিশ মাম্মির জন্য? বিষয়টা নিয়ে আমি খুব বেশিই কৌতূহল প্রবণ।
পিয়ালী ম্যামের সাথে আমার সম্পর্কটা মা-ছেলের মতো হয়ে গেছে। উনাকে দেখলে আমার খুব আপন লাগে, যেন বাংলা মায়ের তৃপ্তি পাই। উনি একদিন শাড়ি পড়ে, সিঁদুর ও লালটিপ দিয়ে মাথায় ঘোমটা চেপে স্কুলে এসেছিলেন। বাংলা মায়ের রূপ যে কতটা সুন্দর সেদিন ম্যামকে দেখেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। তিনি আমাকে অনেকবার বাঙালি খাবার রেঁধে খাইয়েছেন। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলা নববর্ষ, পহেলা ফাল্গুন কোন কিছুই এখন আর আমার অজানা নেই। শুধু অজানা রয়ে গেল বাপির মনটা, কেমন করে তিনি এত চমৎকার সংস্কৃতিকে মনের মধ্যে লুকিয়ে বেঁচে আছেন!
এখন আমার লম্বা ছুটি চলছে। মাম্মি প্যারিস গিয়েছেন অফিসের কাজে। আর বাপি অফিসেই থাকেন বেশির ভাগ সময়। এদিকে আমি সবার অগোচরে বাংলা সাহিত্য পড়ি, বাংলা গান শুনি। বাংলা লেখাতেও বেশ পরিপক্কতা লাভ করেছি। ভালোই যাচ্ছে সময়।
এক মধ্যরাতে ফোন কল পেয়ে বাপি আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "কি হয়েছে মায়ের? এখন কোথায় আছেন?"
কিছুক্ষণ পর আচমকা চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম বাপির রুম থেকে। এটা কি বাপির কান্না? বাপির কাছে যেতে ভয় লাগছিল। ওদিকে, মাম্মিও বাসায় নেই। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। বাপির কাছে যেতেই আমাকে জড়িয়ে

আহাজারি করে ডুকরে কাঁদছিলেন। শুধু তাই নয়, একটা সময় তো তিনি ভুলবশত বাংলাদেশে যাওয়ার আকুলতাও প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষত কিছু শেয়ার করছিলেন না। আর আমিও জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছিলাম না। তবে, দিদিমা যে অসুস্থ তা বুঝতে পারায় আমারও খুব খারাপ লাগছিল।

দুই দিন পর বাপি এসে দেশের বাইরে যাবার প্লান জানালেন, আগামীকাল ফ্লাইট। উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কোন দেশে যাচ্ছি?" মুখ ভার করে উত্তর দিলেন, "বাংলাদেশ যাচ্ছি। সেখানে তোমার দিদিমা থাকেন।"

না জানার ভান করে প্রশ্ন করে বসলাম, " দিদিমা? আর বাংলাদেশ কেন?"

তারপর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে উঠে চলে গেলেন। অবশেষে, বাংলাদেশে যাচ্ছি ভেবেই সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। কিন্তু, দিদিমা'র শরীর এখন কেমন এটা নিয়ে সংশয়ও ছিল।

সন্ধ্যে নাগাদ দিদিমার বাসায় পৌঁছালাম। চারদিকে ব্যাঙ ও ঝিঁ ঝিঁ পোকার পাল্টাপাল্টি ডাক, জোনাকির আলো, আর হাসনাহেনার গন্ধে যেন মুগ্ধ হচ্ছিলাম। দিদিমা আমাকে জড়িয়ে ধরে আধো আধো ইংরেজি ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করতেই বললাম, "দিদিমা আমি বাংলা বলতে পারি।"

বাপি খুব আশ্চর্য হয়ে কৌতূহল বশত আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "অ্যারিক, তুমি বাংলা বলছো? কি করে শিখলে? আমি জানতেও পারলাম না...!!!"

"সব কিছুই কি সবাই জানতে পারে, বাপি? আমার পূর্বপুরুষ যে বাঙালি তা কি আমি জানতাম?"

তারপর আমি বাংলা শেখার বিষয়টা সবাইকে খুলে বললাম। বাপির চোখ ভরা জল আর দিদিমার মায়াভরা কান্না দেখেছিলাম।

আমার মনে দমিয়ে রাখা প্রশ্ন ভারাক্রান্ত মন অগাধ তৃষ্ণা নিয়ে যেন লাগাম ছাড়া ভাবে বলেই উঠলো, "তুমি আমার কাছে থেকে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি লুকিয়ে রেখেছিলে কেন? আর তুমি নিজেকেই বা কেন শাস্তি দিচ্ছিলে; নিজ দেশ, ভাষা, সংস্কৃতিকে লুকিয়ে রেখে?"

সবাই কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা।

বাপি কথা বলতে পারছিলেন না, কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

বাপি হঠাৎ করে উঠে গেলেন। দিদিমা এই পরিস্থিতিটাকে সামাল দিতে স্বাভাবিক কথা বার্তা শুরু করলেন।

রাতে খাওয়ার পর বিছানায় যেতেই আক্কাস চাচা বাপির ডায়েরি দিয়ে বললেন, "ভাইজান এই খানা দিয়ে আপনাকে পড়তে কইলেন।"

সেই রাত আর পরের দিন মিলিয়ে বেশ কয়েকবার ডায়েরিটা পড়লাম। মনে জমে থাকা সব প্রশ্নের উত্তর প্রায় পেয়ে গেছি আমি। যে বাপিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম আমি আজ তার জন্য অনুতপ্ত।

১৯৫২-তে বাপির দাদাজান এবং ১৯৭১-এ তার বাপজান মারা যাওয়ার পর থেকে তার মনে ভয় ছিল। তিনি আর কোন আপনকে এভাবে হারাতে চান না। তাই নিউইয়র্কে পাড়ি জমান। এদিকে দেশ প্রেমের জন্য দাদিমা দেশেই থেকে যান। তাই দিদিমার সাথে বাপির মনো-মালিন্য ছিল। তিনি কখনোই চাইতেন না আমি বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হই।

কারণ, বাংলা ভাষা এবং বাংলা রূপ বড়ই মায়াবতী যে, এই মায়ার কাছে যেন জীবনও তুচ্ছ। এ মায়ায় জড়িয়ে আমার জীবনটাও বিলিন হোক, এটা তিনি চান না।

এখন বুঝতে পারছি, বাপি নিজের ভাষা, সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়েছেন আমার জন্য। বাপি তার দাদাজান ও বাপজানকে হারানোর পর দিশেহারা ছিলেন।

এবং আরও একটি নির্মল সন্ধ্যে, যেখানে আমি আমার মনের সকল প্রশ্নের উত্তরসহ বাপি ও দিদিমার সাথে বসে আছি।

তারা হারানো প্রিয়জনদের স্মৃতি চারণে ব্যস্ত, আমি অনুতপ্ত। বাপির আবেগি রূপটা বাংলার মতোই লুকিয়ে ছিল আমার কাছে। বাংলা মানুষকে কতটা পরিবর্তন করতে পারে তা আজ আমি বুঝলাম।

আজানের ধ্বনি, ধুপের গন্ধ, আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি মিলেমিশে যেন বাংলার সন্ধ্যেটাকে আরো অপরূপ করে তুলেছে। আর আমরা দেশপ্রেমি আপন মানুষগুলোর কথা গর্বিত চোখে স্মরণ করেছি।

এটাই বুঝি আমার সেই কাঙ্ক্ষিত বাংলার রূপ যার পরতে পরতে শুধু মায়া।

মনের মাঝে যেন নিজ গরজেই ভেসে উঠলো...

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা।"

ভালো থেকো সভ্যতা

মেজর মোঃ সাবির আহমেদ (অবঃ)
এমডিএস, এমবিএ, পিএসসি, প্রো-ভিসি অফিস

তোমাদের এ সভ্যতায় নিজেকে বড্ড বেমানান আর “অসভ্য” মনে হয় আমার;
ভোর হতে শেষ রাত্রি অবধি তোমাদের নিরুদ্দেশ ছুটোছুটি,
নিজের সুবিধা লুটে নিতে ক্ষমতাসীনদের পা চেঁঠে খেয়ে,
নিজের পেটে মেদ বাড়াতে অন্যের হৃদপিণ্ড খাবলে নিয়ে,
নিজের মাথা উঁচু করবার তাগিদে অন্যের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তোমরা সভ্যতা গড়ো......!
হ্যাঁ, আমি বড্ড “অসভ্য” প্রাণী আজ........
আমি দু'টাকার লোভে পারিনা দিতে পশুকে সালাম,
আমি লোক দেখানো নাট্যমঞ্চে পারিনা নিঁখুত অভিনয়;
বুকের অন্ধকার কুঠুরীতে পশু সত্ত্বাকে যত্নে রেখে পারিনা দেখাতে মানবদরদী নমনীয়তা......
আমি শুধু তীব্র হাহাকার আর ক্ষুধা নিয়ে আস্ফালন করতে পারি,
আমি পারি চাকায় পিষ্ট হওয়া ভাইয়ের লাশ দেখে হতবাক হতে,
আর পারি ...ধর্ষিত সেই ছোট্ট শিশুটির ছিন্নভিন্ন রক্ত বুকে মেখে নিষ্প্রাণ চোখে আকাশ দেখতে.....!
হ্যাঁ, আমি অসভ্য পশু!
আমি তোমাদের এ সভ্য সমাজে বসবাসের অযোগ্য এক পরাজিত কাঙাল....
আমায় ক্ষমা করো সকল নিষ্পেষিত মৃত প্রাণসকল....
ভালো থেকো “সভ্যতা” ।

A Flutter of Fairies

Tasnim Rahman
Department of Economics, Session : 2018-19

When Qaila had set up the Library of Lost Things, she didn't think of saving a shelf for herself. Everything else had a place to belong. Handwritten labels marked their spots on the wall: *“Forgotten Wallets”, “Unloved Toys”, “Book Board”, “Miramics”*. Heck, she even had shelves labeled *“Jar Jar Blinks”* and *“Flutter of Fairies”*. But no *“Lost Girl”* shelf.

Could a girl get so lost so easily?

Now Qaila belonged on the cold tiled floor. She belonged in every shelf, in every square inch of her tiny library. She was that wallet accidentally left on a desk, that childhood lifeline everyone fell out of love with, those overused dog-eared books. She was that miracle ceramic art that refused to break.

And she was jars full of flickering fairy lights. Too bright yet too weak. Close to useless. Well, the Flutter of Fairies was as useful as decades old halogen lamps could get. The multicolored incandescence overhead multiplied through the layers of Qaila’s gold hijab. She’d never worn gold before.

“It doesn’t go with your skin tone. You’re kinda… too dark?” Anonna had said once. Only once. That had been all Qaila needed to ban everything gold, everything resembling any shade of yellow.

Now it almost made sense why she’d never been happy. Happiness was her gold hijab under a trillion blinking light bulbs. Happiness was the dull yellow around her. She knew it went with every molecule in her. It definitely went with her skin tone, whatever significance that held.

If she were lost tonight, she would be everything she weren’t when she existed. It would be self-discovery seasoned with petty. Or the other way around. Either way, she was already sitting on the floor, legs spread in front, back against the Flutter of Fairies. She had her 1500-page Lord of the Rings extended version on her lap that would have surely gotten a disgusted face and a snide remark from Anonna.

“What a nerd.”

Anonna had grown on her anyway. She’d gotten used to the whiff of cigarette under Anonna’s over-sprayed deodorant. Anonna’s loud voice always burying hers in every duet they’d performed now rang in her ears.

A voice barely made it through the music blasting from her headphones. Qaila pushed them off her

ears and looked up at her brother in front of her—ripped jeans, ancient sneakers and a sweatshirt big enough to fit them both together. The lack of fashion sense was genetic. She still agreed on this one with Anonna.

“Jar Jar Blinks?” He brushed his fingers over the jars.

Qaila shrugged. “You know you admire my puns. And it’s nothing new. What’s really up?”

“Are you permanently settling here?” He eyed her book and the open box of thin mints.

Anonna never understood Qaila’s need for thin mints and their supernatural ability to cool her overused worn-out vocal cords. The upside of a lost friendship was that she could have her favorite cookies without any judgmental glares now.

“I can be lent too, I guess,” Qaila said. She didn’t mind being on display with her collections. She’d wait for someone to pick up their lost friend. Or for someone to simply replace a lost girl with another.

“What does it take for a girl to get lost?” He said.

“Not enough smiles. Not being loud enough. Reading too much. Unhealthy amount of thin mints consumption.” Qaila counted them off on her fingers. The list went on. But she chose just one more. “Hoarding lost things.”

“But do you know what it takes to find a girl?” He took a jar off the shelf, unscrewed it and held it upside down over her. The fairy lights dripped on her. The glass bulbs clinked on each other as they drowned her in fluorescent light.

“A brother and a flutter of lost fairies.

আলেয়া

সামিরা তাসনিম অপরাজিতা
পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯

লিটন বাড়িটা দেখেই বলে উঠলো, “এই সেরেছে! একেবারে মান্ধাতা আমলে এসে পড়লাম দেখছি!”

সে দাঁড়িয়ে আছে নেত্রকোণার এক ছোট্ট জঙ্গলের ভেতর, একটি প্রাচীন বাড়ির সামনে। দোতলা বাড়িটার গঠন দেখে বোঝা যায়, ব্রিটিশ আমলে তৈরি এটা; আর তৈরির পর থেকে বোধহয় কোনো সংস্কার করা হয়নি। এত বছরের রোদ-জলে থেকে এটার এখন জীর্ণদশা।

লিটন একটি মাসিক পত্রিকা অফিসে সাংবাদিকের দায়িত্বে আছে, সেজন্যই তার এখানে আসা। নেত্রকোণার এই অঞ্চলটি নাকি চোরাকারবারীদের অভয়ারণ্য; তাই সে এসেছে এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট বানাতে। আজ রাতে জঙ্গলের কাছাকাছি থাকার জন্য এর চেয়ে ভালো কোনো জায়গা সে খুঁজে পায়নি। বাড়ির ভগ্নাবস্থা দেখে বিড়বিড় করে বললো, “ঘুমানোর সময় ছাদটা মাথার উপর না ভেঙে পড়ে! কোথায় যে আসলাম!”

হেঁটে বাড়িটার সদরদরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলো মিষ্টি চেহারার বাচ্চা একটা মেয়ে; বয়স বড়জোর নয় কি দশ হবে। আকাশি রঙের সুন্দর একটা ফ্রক গায়ে। লিটন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো,

- কেয়ারটেকার কোথায় এই বাড়ির? আমার আজ রাতে এখানে থাকার কথা।
- ভিতরে আসেন। আমি কেয়ারটেকারের মেয়ে।

মেয়েটি লিটনের থাকার জন্য দ্বিতীয় তলার একটি ঘর দেখিয়ে দিলো। জিনিসপত্র বের করে গুছিয়ে রাখা শেষে লিটন খাটে একটু আরাম করে বসলো, আর মেয়েটি তার পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো। তাকে জিজ্ঞেস করলো লিটন,

- তুমি কেয়ারটেকারের মেয়ে? কোন ক্লাসে পড়ো?
- আমি তো স্কুলে যাই না।
- কেন? স্কুলে যাও না কেন?

উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে লিটনের দিকে তাকিয়ে রইলো মেয়েটি। একটু পর চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলো লিটন। মেয়েটার চেহারা মায়াকাড়া হলেও কেন যেন মনে হয় কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। চোখের দৃষ্টিটা খুব তীক্ষ্ণ মেয়েটির, মনে হয় চোখ দিয়ে যেন অন্তরের ভিতরটা দেখে নিচ্ছে।

সন্ধ্যায় মেয়েটি টেবিলে খাবার সাজানো শুরু করলে অবাক না হয়ে পারলো না লিটন। এই বাড়ির কেয়ারটেকার, বাচ্চাটির বাবা, কোথায়? সে তো একবারের জন্যও দেখা দিলো না!

লিটনের মনের কথা যেন পড়তে পারলো মেয়েটি। বললো,

- আইজ তো বিষ্যুদবার, হাটের দিন। বাবার হাট থেইকা ফিরা আইতে রাইত অইবো। আমারে কইয়া দিসে আপনারে সব দেখায়া দিতে।

আবারো অবাক করলো মেয়েটা তাকে। সে বিকালে এই বাড়িতে আসার পর থেকে প্রথম মেয়েটা এতগুলো কথা একসঙ্গে বললো। সারা বিকেল ধরে বাচ্চাটির সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা কম করেনি লিটন, কিন্তু তার সাংবাদিক ধাঁচের পেশাদারি আন্তরিকতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চুপ থেকেছে মেয়েটি। দু-একবার হুঁ-হ্যাঁ তে উত্তর দিয়েছে শুধু। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, কথা না বললেও একেবারে চলেও যায়নি সে। সবসময়ই লিটনের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। ‘হয়তো শহর থেকে আসা মানুষ খুব বেশি দেখেনি’, ভাবলো লিটন, ‘কিন্তু এই কেয়ারটেকারটা আবার কীরকম আশ্চর্য ধরনের লোক! আমি

আসবো জেনেও এভাবে হাটে চলে গেলো!'

হঠাৎ লিটনের চিন্তায় ছেদ পড়লো মেয়েটির গলার স্বরে,

- ভাত খাইয়া নেন।
- তুমি খাবে না? আসো, আমার সাথে খেতে বসো।
- আমার খাওয়া পরে। আপনে খান।

আর কোনো উচ্চবাচ্য করলো না লিটন। সকালের পর থেকে কিছুই খায়নি পেটে ছুচোঁ দৌঁড়াচ্ছে রীতিমতো।

খাওয়া শেষে হাত-মুখ ধুয়ে এসে লিটন দেখলো, এরইমধ্যে তার শোয়ার বিছানাটা ঠিকঠাক করে ফেলেছে মেয়েটি। 'বাহ! বেশ কাজের মেয়ে তো!' মনে মনে প্রশংসা না করে পারলো না সে।

- এই মেয়ে! তোমার নামটাই তো জানা হলো না এখনো।
- আমার নাম আলেয়া।
- বাহ! বেশ সুন্দর নাম তো! তা তুমি আজ খুব ভালোমতো কাজ করেছ, তবে তোমার বাবা এখানে থাকলে আরো ভালো হতো। তাকে বোলো কাল সকালে আমার সাথে দেখা করতে। এইযে চকলেট নাও।

মুঠোভর্তি চকলেট বাড়িয়ে ধরলো লিটন, কিন্তু মেয়েটি চকলেট নিলো না।

- রাইতের বেলা আলেয়ার থেইকা সাবধান।

এই প্রথম হাসি দেখা গেলো মেয়েটির মুখে। হঠাৎ ঘুরে চলে গেলো সে, যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো অন্ধকারে।

একটু থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো লিটন। মেয়েটা মজা করলো নাকি তার সাথে? থাকগে, আজকালকার বাচ্চাদের মতিগতি বোঝাও কঠিন। আজ বরং একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়বে সে, কাল সকাল থেকে অসংখ্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। বাড়ির দরজা-জানালা সব ঠিকমতো আটকানো আছে কিনা দেখে নিলো; একটা ছোট বাচ্চার ওপর তো আর পুরোপুরি ভরসা করা যায় না। অবশ্য বাড়িটার বেশিরভাগ কামরা তালাবদ্ধ করেই রাখা।

যাক, এবার ঘুমাতে যাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে লিটন, দু'চোখের পাতা এক করতে পারছে না কিছুতেই। 'হয়তো নতুন জায়গায় অনভ্যস্ততার কারণে হচ্ছে এমন', ভাবলো সে। শুয়ে শুয়ে রাতের জঙ্গলের বিভিন্ন শব্দ শুনতে লাগলো।

হঠাৎ করেই তার চোখ পড়লো টিমটিম করে জ্বলতে থাকা এক আলোকবিন্দুর ওপর। বিছানার পায়ের কাছের দেয়ালে নেচে বেড়াচ্ছে ওটা। 'জোনাকি নাকি?', ভাবলো লিটন। কিন্তু, আলোটা তো মাঝেমধ্যে আকার পরিবর্তন করছে বলে মনে হচ্ছে।

জ্বলজ্বলে বিন্দুটি থেকে কিছুতেই চোখ সরাতে পারছে না সে; তার সমস্ত চেতনা যেন গ্রাস করেছে ওটা। আস্তে আস্তে নড়ে দরজার দিকে যাচ্ছে, চুম্বকের মতো টানছে লিটনকে। কখন যে বিছানা থেকে নেমে ওটার পিছু করা শুরু করেছে-খেয়ালই নেই তার। দ্বিতীয় তলা থেকে নিচতলায় নেমে এলো সে; কিসের এক দুর্বার আকর্ষণ তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

অনভ্যস্ত হাতে বাড়ির সদরদরজা খুললো লিটন। তার একটু সামনেই রাতের বাতাসে আলোটা নেচে বেড়াচ্ছে-এক অদ্ভুত রহস্যময় আলেয়া, অথচ কিছুতেই সেটাকে ছুঁতে পারছে না সে। মোহগ্রস্তের মতো আলোকধাঁধার পিছুপিছু জঙ্গলের দিকে যাওয়া শুরু করলো লিটন।

আবারো আকৃতি পরিবর্তন করা শুরু করেছে আলোটা, উজ্জ্বল কুণ্ডলীটা ধীরে ধীরে একটা আবছায়ার রূপ নিচ্ছে। আবছায়াটি ছোট একটি মেয়ের, লিটনের চেনা একটি অবয়ব। সে দেখলো, আলেয়া পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মেয়েটির সারা শরীর থেকে আলো ঠিকরে বের হচ্ছে, রাতের বাতাসে চুল উড়ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর পিছুপিছু জঙ্গলের আরো গভীরে ঢুকে গেল লিটন।

পোড়োবাড়িটার খোলা সদরদরজায় ছোট একটি অবয়ব দেখা যাচ্ছে। একদৃষ্টে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে আকাশি ফ্রক পড়া বাচ্চা একটি মেয়ে। লিটনের জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখলো সে। এই লোকটিকে আর কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো মেয়েটির, যাক এতোদিনে তার একটা শিকার জুটলো।

দেবী

মোঃ নাজমুস সাকিব
ডিপার্টমেন্ট অব আইআর, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯

সুউচ্চ গিরিতটে, দেবীকার বাস
আরাধনা নাহি প্রতি, শুধু বিশ্বাস।
মেঘমালা নত হয়ে, গড়িল বসন
ইন্দ্রপ্রস্থে যাবে, প্রলয়ে আপন।
নব কুমারীর বেশে, সৃজিল মায়া
নত সূর্যের বেশে, কমলের ছায়া।
আবির্ভাবেতে যবে, স্নিগ্ধতাময়
শুধু এপথিক মনে, প্রশ্ন যা রয়।
তাই দিয়ে উপমাতে, মালা জপিলাম
দেবী রূপী সত্তায়, প্রেম করিলাম।

নিশীথ রজনী সাঁজি, বাঁশি কে বাজায়?
সন্ধ্যামালতী দিয়ে, ধরণী সাজায়।
নত মুখ রত রয়, কে দেখিল হায়?
বিলাপে দশম দশা, নাহি শোভা পায়।
খর স্রোতে বয়ে চলা, নদ নাহি জানে?
কেউ তারে বারী ধারে, মনে মনে মানে।
ভাবুক মনের মাঝে, কোন সুর ভাসে?
আরাধনা অভিপ্রাসে, শাপ হয় ত্রাসে।
কিন্নরকণ্ঠতে, ভেসে কোন গান?
আসিবে দুয়ারে মোর, করিবে সন্ধান।
কেউ যেন জেগে রয়, তাকিয়ে সে রাত?
আপন অলক শোভে, রাঙাবে প্রভাত।
ভাব লয় গীতি মাঝে, প্রকাশে আকুল?
তবু ও সে রত সাজে, প্রাণের ব্যাকুল।
দিন শেষে সবিনয়ে, জড়িয়ে কে রাখে?
রজনীতে হৃদমাঝে, জোছনা ও আঁকে।

কিছু কথা বাকি রয়, প্রকাশে কে বাঁধে?
আপনে গোপনে রয়, দুর্লভ সাঁধে।
রূপ নাহি পরিচয়, ছবিকর কোথা?
অদ্ভুত অনিমেষে, লুকায় সে ব্যাথা।
পারবাস্তবিকতা, ও হে সে কি মায়া???
যখনি হারিয়ে যাবে, খুঁজে নেয় ছায়া।
ভেজা কেশে কল্লোলে, হবে জীবঃকাল?
খোঁপার পরশে পায়, যামিনীরা তাল।
রূপসাগরেতে ডুব, সরসী স্বরসে?
হৃদয় ব্যাকুলা হয়, মরমি পরশে।
ওই রূপে ভেদ নাহি, সাধিবে কে জন?
পর্দার ওই পাশে, দেবীতে জ্ঞাপন।
অঙ্গে সে মায়াময়ী, সাঁজে কে সঙ্গিন?
সেই আঁচলেতে হয়, গোধূলি রঙিন।
কণ্ঠের সংগীতে, খোঁজে কি প্রাপক?
সেই সুরে তাল রাখি, হইল সাধক।
জড়তায় লয় সুখ, না কোন ফিকির?
ডালায় বরণ করে, ভোরের শিশির।
ভুবন ভোলানো হাসি, দেয় কে দুঃখে??
জীবনের পূর্ণতা, কাজলা সে মুখে।
অলীকে বাসর সাজে, আপন সে মহারাজে
কোন বন মালী?
পুষ্পমালা পুষ্প অঙ্গে, সঞ্চিত সঙ্গে
ফুটিল সে কলি।
তুচ্ছ মরণ হয়, কি ভালবাসায়??
স্রষ্টা হাসিয়া রয়, তাহারি ভাষায়।

Euphoria and It’s Forms

Anika Meher Amin
Department of BBA in Marketing, Session : 2018-19

Know that wave of tingles you feel coming up stomach and stopping at your throat and turning into a vast smile? Yeah that’s exactly it. Euphoria. That immense amount of happiness you feel when something great happens or suddenly or any time God decides to bless you with it.

Retrouvailles, French for rediscovery. The joy of reuniting with someone after a long separation. A friend you haven’t seen in years. Someone you thought you’d never see again. Shows up at school a sudden fine day. You stop, blink, reminisce all the good memories and then you snap out of it. You run forward and hug her with all your might. Reuniting with a childhood friend after ages. All those memories. All that catching up to do. That’s when it hits you.

You worked hard all night. Stayed up, running your eyes through the pages that just seem like a cluster of fibers at this point when your brain decides to stop taking in any more information. You attain a zombie like face with mammoth dark circles but still struggle to ace that one exam you’ve strived for so hard. And your hard work does pay off. That propitious smile that lights up your face once you get the result. That magnificent feeling is all worth it. That’s when it hits you. **Achievement**,

Yes that’s a form of euphoria too. That feeling of relief when you find out your endangered loved one is safe. That one phone call, someone died, might be your brother. Your heart stops. You don’t know what to do. All you can do is pray and hope he’s fine.30 minutes that is 1800 seconds that felt like millenniums later, you get that phone call. “It’s not him…” That’s enough. That’s enough for you to feel that surge of relief followed by that happiness and gratefulness. **Relief**.

Something you’ve been taking for granted since forever. Someone’s existence or just a cozy corner in your room. A snack only your mom makes the best or a special talent only you possess. And then a sudden monumental moment, you realize how important it is to you. Either by its absence or just a random realization, it suddenly holds great significance in your life. **Realization**.

Let’s talk about the **little things** now, shall we? When you finally get that one food you’ve been craving for days, when your crush likes your picture on social media. When you see your mother smile, when your dad says proudly that you’re like him, when your brother gives you a huge bear hug, when your sister makes you a snack. When you spend some quality time with your best friend, sitting at a terrace, talking about the most random things, letting the cool breeze hit your face. Or when you two sit in her room, gossiping, giggling and aimlessly daydreaming about the future. A good solid 10 hours sleep after quite a few long days of hard work or that oddly satisfying feeling

of bursting bubble wraps(come on, you know you enjoy it too).When you're listening to the radio and they play your favorite song or when you're just spending a relaxing day at home, sipping on a steaming mug of coffee while it rains outside. When you finish a book and it has a great ending or when the couple you've been rooting for in a series actually do end up together. When you finally answer nature's call after keeping it on hold for quite a while (Let's face it, we've all been there). It's all about those **little moments**.

Yes, I'm aware I missed out on a lot of points and maybe times when you feel euphoric. But at the end of the day, it's really the little things that matter. It's the thought that counts and it's about living in the moment without attaching yourself to regrets about yesterday or worries about tomorrow. Be optimistic, be kind, be forgiving. And if you're the one who needs the forgiveness, I promise you, you're not evil or a bad person, you were born just as innocent as everyone else. Maybe you just got derailed, maybe God has some plans for you. No, I'm not justifying the wrong. Just don't let all the negativity litter your mind, apologize, change, be a better person. Cause at the end of the day, you still have thousands of chances to change and be happy just as everyone else is. Because misery alternates euphoria.

সমাজিকীকরণের গোড়ায় গলদ

সুপ্রভ চৌধুরী নিপু
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-১৭

"লেখা পড়া করিস না, রিকশা চালাবি?

"এবার রেজাল্ট খারাপ হলে, রিকশা কিনে দিব, রিকশা চালাস"

"কাজের বেটিদের মতো কথা বলিস কেন?"

"না না ঐ স্কুলে ভর্তি করাবো না, ঐ স্কুলে বস্তির ছেলে-পেলেরা পড়ে"

আমরা অনেকেই প্রায় এই কথা গুলোর সাথে পরিচিত। ছোট বেলা থেকেই এই কথা গুলো শুনে শুনে বড় হয়েছি। যদিও মা-বাবা কোনদিনও রেজাল্ট খারাপ হলে রিকশা কিনে দেন নি। এমনকি তারা কথাগুলো মন থেকেও বলতেন না। এই কথা গুলো দিয়ে আমাদের এক প্রকারের ভয় দেখানো হতো, যাতে আমরা ভালো করে পড়ালেখা করি।

এই কথা গুলোর জন্যই আমরা লেখাপড়াই ভালো করেছি কি না জানিনা, কিন্তু এই কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা কাজ ঠিকই হয়েছে, সেটা হলো আমাদের মনের মধ্যে একটা কথা খুব ভালোভাবে গেঁথে গেছে যে সমাজের মধ্যে একজন রিক্সা চালক খুবই নিম্ন শ্রেণির মানুষ। শুধু রিক্সাওয়ালা না, সব্জিওয়ালা, ময়লা পরিষ্কারওয়ালা, বাড়ির কাজের লোক সবাই একই শ্রেণিতে পরে। তারা অসভ্য, অশিক্ষিত, নিকৃষ্ট প্রাণি। এই শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণা ছোটবেলা থেকেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের মনে। এটা এখন আমাদের "সোশালাইজেশনের বা সমাজিকীকরণের" একটা অংশই হয়ে গেছে। আমাদের মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে ঠিকই আমাদের মনের মধ্যে একটা শ্রেণি তৈরি করে দিচ্ছে। যা আমাদের মধ্যে সারা জীবনের জন্য রয়ে যায়। আমরা যতই বই পড়িনা কেন "সব মানুষই সমান ", "কোন কাজই ছোট না" আসলে বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন খুবই কম। ছোটবেলা থেকেই আমদেরকে বিভিন্ন ভাবে বোঝানো হচ্ছে যে একজন রিকশাওয়ালা, সব্জিওয়ালা, রাজমিস্ত্রি আরো অনেকে সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষ আর একজন বিসিএস ক্যাডার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষ।

একটা শিশু যখন চারদিক থেকে এই কথা গুলো শুনে শুনে বড় হয় তখন সাধারণভাবেই সমাজের মানুষগুলোর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি সে দেখতে পায় বা তাকে দেখানো হয়। আস্তে আস্তে শিশুটির বড় হওয়ার সাথে সাথে তার মনের মধ্যে সেই শ্রেণি বিভাজন গুলোও বড় হতে থাকে। যা তার কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, ভাবনা-চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশ পেতে থাকে। যেমনঃ রিকশাওয়ালাকে "তুই", "তুমি" করে বলা আর একজন ব্যাংকার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারকে "স্যার", "আপনি" করে বলা। দুজনেই কিন্তু মানুষ, শুধু পেশার দিক থেকে, টাকা উপার্জনের দিক থেকে, পোশাক-আশাকের দিক থেকে কম-বেশি পার্থক্য। আর যদি হিসাব করি তাহলে দেখা যাবে, একজন ব্যাংকার মাসে হয়তো এক-দুইবার আমাকে সেবা দেয়, কিন্তু রিকশায়ালা প্রায় প্রতিদিনই দিন রাত আমাকে সেবা দেয়। একজন অফিসার এসি রুমে বসে ৮ ঘন্টা কাজ করে, এসি গাড়িতে করে বাড়ি চলে যায়। কিন্তু একজন রিক্সা চালক রোদ-বৃষ্টিতে ভিজে-পুড়ে সারাদিন রিক্সা চালায়, আমাদের সেবা দেয়। তবুও সম্মানের দিক থেকে অফিসারকেই কিন্তু বেশি সম্মান দেয় এবং ব্যবহারের ভিতরেও চলে আসে বিশাল পার্থক্য। আর এই পার্থক্য কিন্তু আমাদের "অবচেতন" মন থেকে এমনিই চলে আসে। কখনই কেউ বলে না রিকশাওয়ালার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে, তবুও আমরা করি। ছোট বেলা থেকে বইয়ে পড়ে এসেছি সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হয়, তবুও আমরা সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষের সাথেই কেন খারাপ ব্যবহার করি। কারণ সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষকে আমরা মানুষ হিসেবে গণ্য করতেই শিখিনি। না আমাদের পরিবার শিখিয়েছে, না সমাজ শিখিয়েছে। এটা বলতে পারি এই সম্পর্কে বইয়ের অনেক বড় বড় রচনা, ভাব-সম্প্রসারণ ঠিকই মুখস্ত করিয়েছে, যার ফলে এ-প্লাস, গোল্ডেন এ-প্লাস অনেক এসেছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এগুলো আমাদের মুখস্ত বিদ্যাকে বিকশিত করলেও আমাদের মনকে বিকশিত করেনি। আর করলেও তা সংখ্যায় অনেক কম, যা উদাহরণ হিসেবেও দেওয়া যায় না। এজন্যই, "বাবার বয়সি একজন রিক্সা চালককে থাপ্পর দিতেও আমাদের

বিবেকে বাঁধেনা", "টাকা আনছি বলে রিক্সা চালককে দাঁড় করিয়ে রেখে আর ফিরে আসি না, অপেক্ষা করতে করতে একসময় সেও চলে যায়", "কাপড়ে দাগ রয়ে গেছে বলে গরম খুন্তি কাজের মেয়ের হাতে পিঠে চেপে ধরি", "খাবার ভাল থাকতে কাজের মেয়েকে ধরতেও দেই না, আর যেই খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যায় তখনি তা কাজের মেয়েটিকে দিয়ে বলি-এগুলো নিয়ে যা, বাসাই গিয়ে খেয়ে ফেলিস" ।

যে রিক্স চালায়, সে দিনে-রাতে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তার উদাহরণ তো আমরা আমাদের সন্তান কে দেই না, বাসার কাজের মেয়েটির সমস্যা গুলোতো কখনো শুনি না বা শোনার চেষ্টাও করি না । কেন বাসি-পঁচা খাবার, অব্যবহৃত জামা কাপড় গুলোই কাজের মেয়েটিকে দিতে হবে? একটু ভাল খাবার, দুইটা নতুন জামা কি দেওয়া যায় না? রিক্সা চালকের অক্লান্ত পরিশ্রমের উদাহরণ কি আমাদের সন্তানদের দেওয়া যায় না? আমরা কেন সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষদের কে শুধু নেতিবাচক উদাহরণ হিসেবেই সন্তানদের মাঝে তুলে ধরি? যে কোন ইতিবাচক উদাহরণ আমরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারদের কে দিয়ে দেই । এমন একটা ভাব যেন রাজ্যের যত ভালো কাজ তারাই করে । কেন তারা কি ঘুষ খাই না? তারা কি দুর্নীতিপরায়ন হয় না?

সমাজের সব শ্রেণির মধ্যেই ভালো খারাপ দুইই আছে এবং তা থাকবে । কিন্তু একটা শ্রেণিকে শুধু নেতিবাচকভাবে সমাজে উপস্থাপন করা, আর একটা শ্রেণিকে ইতিবাচক ভাবে উপস্থাপন করা মোটেও উচিত না । যেটা ঠিক সেটাকে ঠিক বলতে হবে যেটা ভুল সেটাকে ভুল বলতে হবে । যাকে যেটুকু সম্মান দেওয়ার তাকে সেটুকু সম্মান দিতে হবে । একটি সমাজের মধ্যে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সব শ্রেণির মানুষই থাকবে । তাই বলে কি উঁচু শ্রেণির মানুষেরা নিচু শ্রেণির মানুষকে ঘৃণা করবে, অপমান করবে? সেটাতো হতে পারে না । আমাদের সন্তানদের মনের মধ্যে নিচু শ্রেণির মানুষের প্রতি সম্মান বোধ সৃষ্টি করতে হবে । শুধু বই মুখস্ত করালেই হবে না, মনকে আলোকিত করতে হবে । তবেই আমাদের সমাজের সব শ্রেণির মধ্যে সমতা তৈরি হবে । কেউ কাউকে অপমান করে কথা বলবে না, কেউ কাউকে নিচু ভাববে না, সবাই সবাইকে সম্মান করবে, তবেই সুন্দর একটা সমাজ দেখতে পারবো আমরা । আর এই মানসিকতা তৈরির কাজ শুরু করতে হবে জন্মের পর থেকেই, এই দায়িত্ব শুধু মা-বাবা বা পরিবারের নয়, সমাজের প্রতিটা ব্যক্তির ।

মন-চোর

সাদিক আহামেদ সামি
ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-১৭

কবাটে নয়; সিঁদ-কেটে ঢুকেছিল সে
ডেকসু-আলমারি-ট্রাঙ্ক, খালি সব
উদাম বাড়ি আমার, সদা চামচিকার কলরব
মিডসেল্ফটা তেলাপোকার রাজ্য
মাঁকড়টা খোঁপা বাঁধে তার চুলে
গোলা ঘরে নেংটি ইঁদুরের বাসা
ধানের ডুলি চুচায় রয়েছে ঠাসা
চাঙের উপর সস্তা কাঠের সারি
শান্ত ভীষণ আমার টিনের বাড়ি ।
শিকারীর সুনিপুণ চোখ ঘুরে এ ঘর থেকে ও ঘরে
ভয়ে আমার বুকের কাঁপন শুধুই খালি বাড়ে!
অবশেষে তোষকের উপর খুঁজে পায়; জ্বলজ্বলে
মণি নয়; মন
আমার একুশ প্রহরে গড়া অমূল্য ধন
কোন খাদ নেই, ছেঁড়া-ফাটা-জংকার কিছুই না ।
সভয় রানী অভয় দেয়-
অতঃপর সাপের মত কোমল দুটি হাত এগিয়ে আসে
অধরে ঢালে বিষ-রস
স্মৃতি হারাচ্ছি আমি
তার চোখে ভাসে তৃপ্তির হাসি ।

পালকের এপাশ ওপাশ

সামিহা কামাল
ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-১৮

বিকেল হতেই আমার প্রাণ আইঢাই করতে থাকে বেরুবার জন্যে। এই শহরের সবচে বড় গণগ্রন্থাগার দেখাশোনা করি আমি। কিন্তু যতো ভিড়ই থাকুক, বিকেলের পর আমাকে কেউ এখানে আটকে রাখতে পারেনি। একটু আগে একগাদা পুরনো বই এসে পৌঁছেছে। এদের ঘ্রাণে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। কর্পূরের সাথে শুকনো খড়িমাটির গন্ধ মেশালে যা হয়। কিন্তু তবুও আমি বের হওয়াটাই বেছে নিলাম।

আসলে আমি প্রকৃতির ঘ্রাণ পাই ছোট থেকেই। যেমন, নরম বিকেলবেলা থেকে মাদকতাময় একটা সুঘ্রাণ বের হয়। অনেকটা কচি ল্যাভেন্ডার ফুলের সুবাসের সাথে নদীর তাজা হাওয়ার সুবাস মেলালে যা হয়।

প্রতি বিকেলে আমি বড় রাস্তা ধরে হেঁটে যাই শহরের আর্ট গ্যালারিগুলোতে। আজ যাবো পশ্চিমের একটায়, প্রদর্শনী দেখতে। ফুটপাত ধরে এগিয়ে যেতে কি একটা মিষ্টি ঘ্রাণ নাকে পেলাম না? আহা যুবতীর শরীরের ফুলেল পারফিউমের সাথে যোগ হয়েছে সুখের মিষ্টি সুবাস। সুখের সুবাসের আবার নানান ভাগ-বিভাগ আছে। এ মেয়ের সুঘ্রাণে আছে তৃপ্তি। আছে নতুন সম্ভোগের ধারা, উত্তেজনা আর আগামী সুখী দিনের প্রত্যাশা। আমি দূর থেকে ঘ্রাণ শুঁকে একটা খেলা প্রায়ই খেলি। "ছকখেলা"।

দ্রুত নাক উঁচু করে এক ফুসফুস ঘ্রাণ নিলাম। ছক কাটলাম। তরুণীর বিয়ে হয়েছে নতুন নতুন। একহারা গড়নের মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছিলো। বিকেলের হাওয়ায় তার অবাধ্য চুল বারবার মুখে এসে পড়ছিলো। চোখ ছোট করে আমি দেখলাম, মেয়েটির হাতে চকচকে হীরের আংটি। এমনভাবে সে চুলের গোছা সরাচ্ছে যে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তার বিয়ের আংটি সবাইকে দেখাতে যেন ভীষণ উন্মুখ। হা হা, আমি এ খেলায় কখনোই হারি না।

এই প্রদর্শনীতেই আমার জীবনের সবচে বড় ধাক্কাটা অপেক্ষা করছিলো। একটা প্রমাণ সাইজের পেইন্টিং। আপাতদৃষ্টিতে সাদামাটা মনে হবে এমন একটা মেয়ে। কিন্তু একটু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায় তার চেহারার বিশেষত্ব হলো- সে মুখ ঢলোঢলো না। তবুও কেমন একটা মায়া আর ক্ষোভ তার চোখেমুখে। কমনীয় মুখ-উন্নত নাক-প্রশস্ত কপাল আর চোখে জমে আছে জলের সমুদ্র। যেন ঠিক এর পরের চিত্রতেই কপোল বেয়ে টপটপ করে জল গড়াতে শুরু করবে। যতোই আমি তন্ময় হয়ে দেখছিলাম ততোই একটা তুলনাহীন সৌরভ আমার মস্তিষ্ক গ্রাস করে নিচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো চোখের সামনে একটা পেঁজা তুলোর ঢিপ প্রলেপ পড়ে যাচ্ছে। আশেপাশের সবকিছু, সাথে ঐ চিত্র- সব হারিয়ে যাচ্ছে।

সেদিন অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর থেকে ঐ চিত্র মাথা থেকে সরাতেই পারিনি। আমি যখন ছোট ছিলাম, বেশ ভালোই আঁকতে পারতাম। স্কুল পাশের পর আমার আর্ট শিক্ষকের কাছে গিয়েছিলাম। তাকে বলি পরবর্তী পড়াশোনা আমি আর্টে করলে কেমন হয়। তিনি আমায় বলেছিলেন, আমার হাত ভালো। তবে আমার নাকি রঙের সামঞ্জস্য একেবারেই নেই। আমার আঁকা তাই হয় বড্ড বেশি 'বাস্তবতাবর্জিত' ও 'কিম্ভূত'। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস আমার ছিলো না কখনোই। সবসময় নিজেকে হতভাগ্য আর অপূর্ণ ভেবে এসেছি। তাই সেই কথা শুনে আর কোনোদিন আমি আঁকিনি। কিন্তু বুকের ভেতরে একজন শিল্পী তো বাস করতোই, সে প্রতিনিয়ত শিল্পের ঘ্রাণ চাইতো। তাই আমি ছুটে যেতাম বারবার।

এই অপার্থিব তরুণী, তার অবয়ব, তার আফিম মেশানো সৌরভ আমাকে এতোটাই প্রভাবিত করে যে আমি এতো বছর পর ক্যানভাস নিয়ে তাকে আঁকতে বসি।

আমি Eidetic Memory এর অধিকারী তাই একদেখায় খুঁটিনাটি মনে রাখা আমার জন্যে অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু বিপত্তিটা

বাঁধে সেই সৌরভ নিয়ে। যতোই আঁকি, শেষ আঁচড় দেয়ার পর যখন বুক ভরে শ্বাস নেই- সেই সৌরভ পাই না।

অবশেষে একদিন। আমি সফল হলাম। আমার আঁকা চিত্রপটে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পেলো। চেনা সেই মোহময় সৌরভে আবিষ্ট হয়ে রইলাম। তার তকতকে নিখুঁত ত্বকের পরে একটা তুলতুলে পালক। সেই পালকের পরে তার ত্বক বলিরেখায় আচ্ছাদিত। এপাশে কান্নাভরা সেই চোখ, পালকের ওপাশে কী তার তেজ! পাতলা ঠোঁটের কোণায় একটা রহস্যময়ী হাসি ঝুলে আছে। যেন আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত এক নারী-বার্ধক্য যাকে করেছে আরো সুন্দরী, আরো বেশি যৌবন উদ্দীপ্ত। বয়স মানুষকে যে আরো বেশী প্রশান্ত করে, সৌম্য করে তুলে আমার তরুণী মন তার প্রমাণ। দুঃখ যে মানুষকে পরিপক্ক করে তুলে একথা সত্যি। এজন্যে যুবক বয়সে মানুষ দুঃখে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। কিন্তু বয়স যত বাড়তে থাকে তার ভেতরের তেজ বাড়ে, সে প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে শেখে। জীবন নামক তেজী বাঘের সাথে যুঝতে যুঝতে মানুষ অগ্রসর হয় মহাপ্রয়াণের দিকে, তার অভিজ্ঞতা আর অবদান নিয়ে।

পরের প্রদর্শনীতে আমি চিত্রখানা জমা দিই। আলোচনা-সমালোচনা আর শিল্পীখ্যাতি সবই আমার ঝুলিতে জমা হতে থাকে। এক বিখ্যাত পত্রিকার সাংবাদিক আসে দেখা করতে।

-আপনার আঁকা চিত্র তো এতোটা জনপ্রিয় হলো। আপনি কি জানেন এর অর্ধেক বেনেরিসের আঁকা একটা চিত্রের সাথে হুবহু মিলে যায়? তবে আপনার রং নির্বাচন মেলেনি, দৃশ্যপট মিলেছে।

-আমি বেনেরিসকে অবশ্যই চিনি। ইতালির সেই যুগের সেরা শিল্পী তিনি, আসলে আমি তার আঁকা চিত্র একটা প্রদর্শনীতে দেখতে পাই। কিন্তু শিল্পী যে বেনেরিস তা আমি পরে পত্রিকায় সমালোচকদের রচনা পড়ে জানতে পারি।

-আপনার রং নির্বাচনের ধাঁচ নিয়ে কি বলবেন? মেয়েটির চুলের রং গাঢ় নীল, ঠোঁট হালকা সবুজ-হলদে মেশানো। আর চোখ? চোখে এমন কটা একটা রঙ। অনেক শিল্পবোদ্ধা এর প্রশংসা করছে। অনেকে আবার একে নানাভাবে সমালোচনা করছে। আপনি এ বিষয়ে কি বলতে চান?

-পিকাসোর একটা কথা জানেন তো? Everything you can imagine is real.

সাক্ষাৎকার শেষে সাংবাদিক কফি খেয়ে হাঁটা ধরলেন। আমি আমার কক্ষে ফেরত এলাম। আমার নষ্ট চোখ, যাকে সবসময় দোষ দিয়ে এসেছি সুন্দর পৃথিবীটাকে এমন ছিঁবড়ে করে রাখার জন্যে। আজ সেই চোখ দিয়েই সব যেন বড় বেশি ভালো লাগে। আমার নীরস ছাইছাই চোখে আমি সেই তরুণীর অর্ধেক মুখই যে জ্ঞান হারানোর আগে দেখতে পাই একথা কেউ জানবে না।

আর জানবে না আমি যে জন্ম থেকেই বর্ণান্ধ।

The Blazing Monster Dwelling in Dhaka City

Srabonti Habib Proma
Department of BBA in Marketing, Session : 2017-18

It was a dismal spectacle to behold on the 28th of March 2019 at the Banani FR Tower. A gigantic conflagration had engulfed the sky-vying building. All hell had broken loose. Innumerable people were trapped inside and were striving to survive. Many aimed to flee from the catastrophic fire using the fire exit but little did they know that they will find the gates closed. By the irony of fate, numerous lives were held captive inside the burning building. In the hope of survival, a handful of petrified people shattered the colossal glass windows and waved to the firemen below for help. Among them, a few crept out of the window, balanced themselves on ledges and grasped the cords of the elevator to descend and distance them from the devouring inferno.

The consternation of man in such circumstance is extremely difficult to fathom. The captives of the blazing conflagration slid down the cords and tiptoed with utmost care into the neighboring building. It was heart-wrenching to witness some people who failed to do the same and plummeted to their death instead.

The indomitable fire took 26 innocent lives and injured 70. These fire incidents are reiterating in our city at an alarming rate. Why were the security exits of the offices in FR Tower locked? Why it did not house sufficient quantity of firefighting equipment? Why were there no clear maps or directions on how to avail the fire exits? These are some of the burning questions that remain unanswered forever.

Precaution is better than cure. It is high time that builders stop violating the building codes and practices and opt for safer dwelling instead. In addition to this, the Government of Bangladesh must develop and enhance the firefighting industry to prevent such dreadful tragedies in future. Mr. Phanawatnan Kaimart, a man from Thailand, invented the ‘Elide Fire Extinguishing Ball.’ This ball has unique property of dousing the fire safely and in a more convenient way than a sturdy fire extinguisher. It is a mere powder which will bring hazard to neither the people nor the environment. If these balls are imported to our country and made available to the firemen as well as the citizens, then the number of fire incidents in Dhaka city is bound to decline drastically.

The air in Chawkbazar and Banani FR Tower is still heavy with a concoction of utter grief and dismay. The bereaved families are failing to recover from the tremendous shock they lately received. They have plunged into an ocean of despair and desolation. How much more tears do they need to shed to culminate these gruesomely recurring incidents?

ভালোবাসা ও নারী

আলমগীর খোরশেদ
মাস্টারস ইন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (এমআইসিটি)
স্টুডেন্ট আইডি নং - ১৮০৩০৩৩

তখন সন্ধ্যাবেলা।

আমার সাত বছরের রাজকন্যা অথৈ টিভিতে মটু-পাতলু দেখায় ব্যস্ত। বললাম---

: অথৈ মা, আব্বুকে খবর দেখতে দাও।

: নো, নেভার, দিবো না, দেখছোনা, আমি কার্টুন দেখছি।

বিকেলে বই মেলায় গেছিলাম, ATN নিউজে সাক্ষাতকার নিলো। এবার দুটো বই প্রকাশিত হয়েছে। একটা গল্পগ্রন্থ -- হৃদয়ের রক্ত ক্ষরণ, অন্যটা উপন্যাস--- দূরের নীল প্রজাপতি। অথৈকে সকালে কিন্ডারজয় কিনে দেবো, এই শর্তে টিভি'র রিমোট হাতে নিয়ে চ্যানেল চেঞ্জ করলাম। পহেলা ফাগুন, বসন্ত উৎসব এর আনন্দে মাতাল টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বইমেলা ও বিভিন্ন পার্কসমূহ। লক্ষ লক্ষ লোকে লোকারণ্য। টিনএজ থেকে শুরু করে বাবু'র মায়েরা পর্যন্ত বসন্ত উৎসবে ব্যস্ত। পড়নে বাসন্তী রঙের শাড়ি, হাতে, খোঁপায় ফুলের মালা, মাথায় ফুলের তৈরি টুপি। মেচিং করে কাঁচের চুড়ি, ঠোঁট দুটো লাল লিপস্টিক ও পা আলতায় রাঙ্গাঁনো। কারো কারো গালে--"বসন্ত উৎসব"-- লিখে রেখেছে। ছেলেরা পড়েছে হলুদ পাঞ্জাবি। ওরা প্রিয় মানুষটির হাত ধরে হাঁটছে, অকারণে হেসে উঠছে, সেলফি তুলছে। জগতের সবটুকু সুখ ওদের চোখে, হাসিতে, হাঁটায়, চলায়। বাসন্তী, সবুজ, লাল-- একাকার হয়ে গেছে পরিবেশ। বয়স যতোই হোক, নেমে এসে পনেরোতে দাড়িয়ে আছে যেনো।

ভ্যালান্টাইন ডে নিয়ে টিভি রিপোর্টার ব্রিফ দিচ্ছে, অথৈ আমার কাছে কোল ঘেঁষে বসেছিলো, বলে উঠলো-

: আব্বু, ভ্যালেটেন ডে কি?

: এসব ছোটদের জানতে হয়না, যাও খেলো গিয়ে। --- ওর মা বলে উঠলো।

: না আমি আব্বুর সাথে টিভি দেখবো।

: যাও বলছি----দাঁড়াও তোমাকে ডল হাউজটা নামিয়ে দেই, খেলো।

অথৈ অসহায়ের মতো আমার সাপোর্ট পেতে তাকিয়ে থাকে। বলি---

: থাক না। কেনো জোর করো?

: একদম প্রশ্রয় দিওনা।

ডল হাউজ নিয়ে মন খারাপ করে আমার রাজকন্যা পাশের রুমে চলে যায়। মনটা খারাপ হয়ে যায়, আহারে বেচারি। ইদানিং খুব প্রশ্ন করা শিখেছে। আর জেন্ডার নিয়ে খুব কৌতুহল। পাখি, ফড়িং যা-- ই দেখে, কোনটা মেয়ে, কোনটা ছেলে--- এ নিয়ে প্রশ্ন করবেই।

মনের ডায়াফ্রামে সনোমিটারের মতো কম্পন শুরু হয় আমার। ভালোবাসা---- বিষয়টা নিয়ে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো উজ্জীবিত হয়ে নানান যুক্তি এসে ভীড় করে চিন্তার দরজায়। দিনক্ষণ ঠিক করে, ঘটা করে সিডিউল বানিয়ে, নিয়মতান্ত্রিক ভালোবাসা কি হয় কখোনো? ভালোবাসা তো বহতা নদী, যতো বাধা আসুক, সমুদ্রকে ভালোবাসা, বিলীন হয়ে যাওয়া তার টার্গেট। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাবার প্রয়োজন, তেমনি মনকে বাঁচাতে দরকার আবেগ, মনের টান, আর মন খোলা দ্বিধাহীন ভালোবাসা। আবেগই মানুষকে চালিত করে, বেঁচে থাকার পথ বলে দেয়। যার আবেগ বেশী, সে মায়াবী--- মায়াবতী হয়।

লেখক কবিদের আবেগ, সাধারণের চেয়ে সব সময় এক ডিগ্রি বেশী থাকে বলেই তারা লিখতে পারে। আবেগ থেকে ভাবনা আসে, আর এই ভাবনাকে অক্ষর দিয়ে সাজিয়ে সাদা কাগজে যা আঁচড় দিয়ে যায়, তা হয়ে যায় কারো মনের কথা, জীবনের কথা। জীবনের প্রতিচ্ছবিই তো সাহিত্য। ফুলে ভরা এই বসন্তে শিমুল, পলাশ, টগর-- সাজে লাল আগুনের হল্কায়। দিনে হালকা গরম, রাতে পাতলা কাঁথার শীত, দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে অস্থির হয়ে কোকিল ডাকে তার প্রিয়াকে। আমের মুকুল, কাঞ্চন ফুল, সব কিছু বলে দেয় বসন্ত এসে গেছে। রাত ভোর হলেই ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভালোবাসা দিবস।

ভালোবাসা কী?--- ভালোবাসা একটি মানবিক অনুভূতির নাম। কোন কিছুর উপর আনন্দময় ভাববোধ হলো---- ভালোবাসা। বেঁচে থাকার রসদ, যদি না থাকে, জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ। ভালোলাগার অপর নাম ভালোবাসা। এ নিয়ে ও বোদ্ধা মহলে তর্ক। ভালো যে কাউকেই লাগতে পারে, কিন্তু সেটা ঐ লাগা পর্যন্তই, লাগা থেকে বের হয়ে ভালোবাসা পর্যন্ত না-- ও গড়াতে পারে। এখন প্রেমিকের আর আকুতি কাজ করেনা, একটু কথা, একটু দেখার জন্য। এখন ইন্টারনেট, ফেইসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসআপ, ইমো, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম এ চ্যাটিং করে বিকাশ ঘটে রিলেশনের। সাত সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে থাকা মানুষটিকে দেখার, কথা বলার সেই ব্যাকুলতা, আকুতি এখন হারিয়ে গেছে। নিমিষেই প্রযুক্তির আশীর্বাদে যোগাযোগ ঘটে , কথা, দেখা ও যায়। এখন কেউ নির্ঘুম রাত পার করেনা, আকাশের রূপালী চাঁদ, জোনাকি মেয়েদের সাক্ষী রেখে, চোখের জল ফেলে, জলের ফোঁটা পড়ে চিঠির লেখা অস্পষ্ট হয়না, গোলাপের পাপড়ি চিঠির ভাঁজে ঢুকিয়ে, পাউডার মিশিয়ে, লাল লিপষ্টিকে ঠোঁট লাল করে, চিঠির সম্বোধনে দেওয়া ঠোঁটের ছাপ, আর দেখা যায়না। আধুনিকতা, ডিজিটাল লাইফ, যান্ত্রিকতা, এখন কাউকে দেবদাস হতে দেয়না। ভালোবাসার মানুষটাকে হারিয়ে চন্দ্রাবতি ও হয়না কেউ। ওয়েটিং লিস্টে থাকা আরেকজন মানুষের পিছু নেয়।

একটা মানুষ---- সে হোক নর বা নারী, জীবন চলায় কতো পারসেন্ট ভালোবাসাইবা পায়? জন্মের পর মা, শৈশবে মা বাবা, যৌবনে বা পরিণত বয়সে মনের বা ভালো লাগার মানুষ। বিয়ের পর সারাদিনের ক্লান্তি অবসন্ন দেহে মানুষটা পাশে ঘুমিয়ে পড়ে। সে তখন কূলের বউ, পুরুষের একার না। দেবর, ভাসুর, ননদ, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, জা কতো কিছু মানিয়ে চলতে হয়।

সারাদিন পর রাতে একটু কাছে পাওয়া, তাও অন্ধকারে ফিস ফিস করে জীবনের কতটুকুই বা চাওয়া পাওয়া হয়? তারপর বছর গড়ালেই দুজনের মাঝখানে আর একজন শোয়। তাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে যায় মানুষটি। মনের অজান্তেই একটা গ্যাপ এসে যায়। তখন ইচ্ছে করলেই কাছে পাওয়া হয়না, নির্দিষ্ট পরিবেশ, সময় মেইনটেন করতে হয়। ঘুমিয়ে যাওয়া মানুষটা কে আর জাগানো হয়না। পাশ ফিরে শুয়ে একাকী জেগে হারিয়ে যেতে হয় স্মৃতির অথৈ সাগরে।

ভালোবাসা সেতো চিরকালের। এটা তো কোন তারিখ মানে না। মনের গহীন কোণে যে মানুষটি একবার ঢুকে যায়, আমৃত্যু শিকড় ছড়িয়ে ঢুকে থাকে চিন্তায়, চেতনায়, মস্তিস্কের স্নায়ুগুলোতে, আত্মায়। মন ও দেহ মিলে আঁকড়ে ধরে রাখে মনের মানুষটিকে। জীবন চলায় ব্যস্ততম পথে ভুলে যেতে পারে মন, কিন্তু দেহ ভুলতে পারে না। প্রতিটি অঙ্গ স্পর্শের অনুভবকে ধরে রাখে স্মৃতি জাগানিয়া হয়ে। ভালোবাসার কোন সংজ্ঞা হয়না। বাবা মা ভাই বোন, -কে ভালোবাসা, সন্তান, মনের মানুষ, বন্ধু কে ভালোবাসা, সব জায়গায় এটা ভেরিয়েশান করে। ভালোবাসার বড় শর্ত হলো সেক্রিফাইস, মন, মনন, মায়াময়, কেয়ারিং, বিপরীত মানুষটির জন্য একটা এক্সট্রা ফিলিংস কাজ করা। যাপিত জীবনের যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের রোবট বানিয়ে দিলেও, সুযোগ পেলে নিজ থেকে কাছের মানুষটিকে একটু সময় দেওয়া, হাসি মুখে -- আই লাভ ইউ বলতে না পারলেও টিভি দেখা বা কোথাও যাবার সময় হাতটা টেনে নিয়ে নিজের হাতের মুঠোয় রাখা, অফিসে যাবার প্রস্তুতি ঐ মানুষটার চোখকে আয়না বানিয়ে মাথায় চিরুনি বুলানো যায়। চোখে চোখ রেখে বুঝিয়ে দেওয়া যায় বিপরীত মানুষটাকে, তুমি একা নও, আমি ছিলাম, আছি, থাকবো। দুজন একে অপরকে রেসপেক্ট, মূল্যায়ন একটা বিরাট ফ্যাক্টর যাপিত জীবনে। দুজনের মাঝে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ছাড় দেওয়া মনোভাব সুখী হবার একটা বড় শর্ত। যে কোন ভালোবাসার সম্পর্কে ইগো, প্রেস্টিজ ধরে রাখা সু সম্পর্কের অন্তরায়। ভালোবাসার মানুষটার সাথে ছোট হবার কিছু নেই বা বড় ভাবারও কোন অবকাশ নেই।

বিয়ের পর সঙ্গী/সঙ্গিনীকে ভালোবাসি বলা হয়ে উঠেনা।

যাপিত জীবনের চাহিদাগুলো সামনে চোখ রাঙ্গায়। এটা নাই, ওটা নেই, এই আনো, সেই আনো, শুনতে শুনতে ভালোলাগার মানুষটি আর প্রিয়তর থাকেনা। যদি ফিনানসিয়াল সলভেন্সি না থাকে, নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তেমন পরিবেশে ভালোবাসাকে জানালা দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধা দিতে হবে দুজনকেই। বর্তমান পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা

থাকলে ও দুঃসময়ে সঙ্গী কে সাপোর্ট করা সুখী হওয়ার আরেকটি কৌশল।

বর বধূর সম্পর্কটা হলো পুকুর ভরা জল। যাতে ইচ্ছে মতো সাঁতার কাটা। আর মনের মানুষটি হলো বৃষ্টির ফোঁটা, শরীর ভিজে একাকার তবুও তাকে ধরে রাখা যায়না। বর বধূর সম্পর্ক টা হলো বৈদ্যুতিক বাতি, আঁধারের সাথি হয়ে পথ দেখাবে। আর মনের মানুষটি হলো জোসনা চাঁদের আলো। যা অনুভব করা যায়, স্থায়ীভাবে ধারন করা যায় না। ভালোলাগার মানুষটি হলো দুরন্ত কিশোরের অতি যত্নে গুছিয়ে রাখা ঘুড়ি, নাটাই, কিংবা বিবাহিত নারীর ট্রাংক বা আলমিরাতে লুকিয়ে রাখা বিয়ের শাড়ি। যা বছর গড়ালেই খুলে দেখা, আর স্মৃতি রোমন্থন করা। সম্পর্ক ভেদে ভালোবাসার গভীরতা নির্ভর করে। কেবল এক তরফা আই লাভ ইউ বলেই সম্পর্ক হয়ে যায় না। প্রয়োজন ও সময় মানুষকে পথ দেখায়। মানুষ তার প্রয়োজন--- চাহিদার কাছে অসহায়।

মানুষ কখনো তার শিকড় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তার আচরণ, ব্যবহার, কথায় বেরিয়ে আসে তার কালচার, বংশ, ফ্যামিলী ব্যাকগ্রাউন্ড। যে ছিলো স্বপ্ন, আশা, কোনো কারণে যদি তার সাথে মিলন না হয়, বুকের ভিতর ধরে রাখতে হয় আমৃত্যু। মন না চাইলেও সংসার করে যেতে হয়, চাপিয়ে দেওয়া সম্পর্কের বোঝা কাঁধে নিয়ে। বছর গড়ায়, এক ছাদের নীচে এক বিছানায়। বেবি হয় যথারীতি। তবুও কোন এক নির্জন দুপুর, ঘুমহীন এপাশ ওপাশ রাত, কারেন্ট চলে যাওয়া অন্ধকার রাতে অচেনা নিজেকে আরো অসহায় মনে হয়। বর্তমান মানুষটির সাথে কোনো মান অভিমান হলে সামনে এসে দাঁড়ায় অতীতের স্মৃতিময় সেই মানুষটি। অবচেতন মন সহসায় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, এর চেয়ে ওই কি বেশি ভালো হতো, যাপিত জীবনে? ইচ্ছে করে জানতে, কেমন আছে সে? বেবি কয়টা, ওর মানুষটা আদর করে তো ওকে? ও সুখী তো? কিন্তু বাস্তবতা সামনে এসে চোখ রাঙ্গায়ে ধমক দেয়। এ হয়না। এমনটি এখনো সমাজ মেনে নেয়নি। কেবল স্মৃতির জানালা খুলে যায়, চাপা একটা কষ্ট বুকের ভিতর দলা পাকিয়ে উপরে উঠে আসে, ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর থেকে বুঁস করে বেরিয়ে আসে।

ভালোবাসা------আমার কাছে পাখির বাসা বলে মনে হয়। ভালোবাসা পাখির বাসা। প্রকৃতিতে পাখিদের তার সঙ্গীটির সাথে এতো মিল, ভালোবাসা, তা আর কোন জীবের নেই। প্রবল আকর্ষণ, মায়া, ভালোবাসা নিয়ে ওরা গাছের ডালে পাশাপাশি গা ঘেষে বসে থাকে। ঠোঁট দিয়ে একটি অপরটিকে শরীর খোঁটে দেয়, আদর করে। ওরা একে অন্যের চোখের আড়াল হলেই চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। ডিম পাড়ার সময় হতেই বাসা বানায় দুজনেই খড় কুটো দিয়ে। মেয়ে পাখি ডিম পাড়ে, তা দেয় ডিমে, পালা করে। কিছুদিন পর পাখির বাবু বের হয়ে আসে ডিম থেকে। বাবুটা বড় হয়, পাখনা গজায়। উড়তে শিখলেই বাসা ছেড়ে চলে যায় পাখিরা। গাছের ডালে কিংবা কোটরে একরাশ শুন্যতা নিয়ে পড়ে থাকে বাসাটি। যেখানে ভালোবাসা, সেখানেই মিলনের সুর। বিধাতা তাঁর অস্তিত্বকে ঢেলে দিয়েছেন একজন নারী'র মাঝে। নারীতেই সৃষ্টি। নারী বা মা-ই সব। মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে, এই ব্রহ্মাণ্ডকে বেষ্টন করে আছেন। পবিত্রতম ঈশ্বর নারীকেই ক্ষমতা দিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টিকে কনটিনিউ করতে।

: কি হলো, এতক্ষণ ধরে ডাকছি, শোননা?....অথৈয়ের মা খিঁচিয়ে উঠে।

: কি, বলো।

: সারাক্ষণ তো ফেইসবুকেই বুদ হয়ে থাকো, আমার কথা শোনবা কেমনে?

: ফালতু কথা বলোনা। লেখালেখি আজকাল ফেইসবুকেই করে সবাই।

আমার রাজকন্যা কই?

: রাত কয়টা বাজে দেখছো? মেয়েটা না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

: এতো বকাঝকা করো কেনো তুমি মেয়েটাকে। এসব ঠিক না।

: টেবিলে ভাত বাড়া, খাও, আমার ঘুম ধরছে। গেলাম আমি।

অথৈয়ের মা ঘুমাতে চলে যায় পাশের রুমে। বিছানায় মেয়েটার কাছে গেলাম। ঘুমিয়ে আছে। দূর তারাদের দেশে হারিয়ে যাওয়া, আমার মা--- যেনো আমার মেয়ের রূপ নিয়ে এসেছে সংসারে। আমার মায়ের সবগুলো বৈশিষ্ট্য পেয়েছে অথৈ। ইদানীং খুব বায়না ধরে সে। মা বকা দেয়, তাই সব বায়না আমার কাছে। যতটুকু সাধ্যে কুলায়, দেই, ওর মন ভাঙ্গতে দেইনা। অথৈ আমার আত্মা। আমার ভালোবাসা।

একটু প্রশান্তির খোঁজে

রফিকুল ইসলাম
ডিপার্টমেন্ট অব গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-১৭

শহুরে কান্নার রোল নেমেছে।
বদ্ধতায় জেঁকে বসেছে পুরো পৃথিবী।
সবুজ গাছপালারা বসন্ত হারিয়ে বহুকাল হলো ।
আকাশ থেকে নামছে এসিড বৃষ্টি।
গনগনে রোদ। শরীরটা যবনিকায় পতন।
ঘুম নেই। বহুদিন বিকেল দেখি না।
এস্ট্রেতে ছাই জমেছে। শহুরে ভালোবাসা নেই
হ্যারিকেনের মৃদু আলো দেখা যায়না।
বউদের চিমনির কালি মুছার বালাই নেই।
অন্তঃপুরিতে মায়া কান্না চেপেছে।
ভারি নিঃশ্বাসে জমাট। পুনঃজন্মের আশ্লেষ নেই।

তবুও আমি এ শহরেই থাকি।
বসন্তের বাতাস খুঁজে বেড়াই শহরে, সারাদেশে।

আকাঙ্ক্ষার প্রয়াণ

ফাহ্‌মিন চৌধুরী তাজিম
ডিপার্টমেন্ট অব 'ল', শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-১৮

শফিক সাহেবকে আমি নিজ হাতে গলা টিপে হত্যা করলাম। ধড়ফড় করছিল দেহটা। চিৎকার দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিল, তেষ্টা ছিল বেঁচে থাকার, আর ক'টা দিন এই ধরণী দেখতে দেখতে বাঁচার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারছিলেন না। হাতটা ধরেছিল মনা মিয়া। প্রত্যেক কোরবানির ঈদে একাই গরু ফেলে দেয়ার মতন রেকর্ড গড়া নামকরা পার্টটাইম কসাই এই মনা মিয়া। কোরবানির এক মাস আগেই তার হাকডাক পড়ে যায়। মনার আবার এক নীতি আছে, আড়ালে মনুষ্য সুশীল সমাজ তাকে "নীতিবান কসাই" বলেও মনে করেন। সামনে ডাকার সাহসটা আর হয়ে ওঠেনা। মনা মিয়ার নীতিখানা হলো তিনি এলাকার সবচেয়ে বড় গরুটা নিজ হাতে ফেলবেন। তাই যতই হাকডাক দিক, সে ওটাই ফেলবেন। এজন্য এলাকার শীর্ষস্থানীয় ধনী রহমান সাহেবের সাথে তার গলায় গলায় খাতিরও বনে গেছে। কসাই হোক আর যাইহোক মনা মিয়া মানুষটা বেশ মিশুক। আবার রহমান সাহেবেরও প্রতিবার সবচেয়ে বড় গরুটা কেনা চাই ই চাই। গরুর পিঠে থাপ্পড় মারতে মারতে পান চাবাতে চাবাতে সবাইকে দাম বলতে বলতে বাসায় ফিরবেন এটা তার একটা সিজনাল শখও বলা যায়। এজন্যই বোধহয় বছরের বাকি সময়গুলাতে টাকা কামাই করে যান একাধারে এদিক ওদিক বিবেচনা না করেই। মনা মিয়াও তাই কোনোভাবে আটকে জেলে যেতে নিলেই রহমান সাহেবকে দিয়ে ফোন করে জামিন পেয়ে যান। তাদের মধ্যে এক সুন্দর অসম অবৈধ ভালবাসাবোধ আছে।

ওদিকে শফিক সাহেব তো বুঝেই গেছে আজ তার শেষদিন। কিন্তু তিনি ভেবে পাচ্ছেন না মনা নিজে না মেরে কেনো আমাকে দিয়ে মারছেন! তিনি এটাও বুঝছেন না খোঁচা খোঁচা দাড়িযুক্ত চোয়ালভাঙা এই ছেলেটিই বা কে? তার সাথে কি এমন শত্রুতা যে সে শফিক সাহেবের মতন নিতান্ত আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া মানুষকে খুন করতে চাচ্ছে? এসব ভাবছে আর চিৎকার দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। লাভটা হয়নি, মনা মিয়া বেশ সুন্দর করেই ধরে রেখেছিল। উনি না পেরেছে চেঁচাতে না পেরেছে বাঁচতে। একদম গলা টিপেই খুন করে ফেললাম।

এতক্ষণ পর বুঝতে পারলাম আমার হাত কাঁপছে! না আস্তেধীরে নয়, বরঞ্চ বেশ অস্বাভাবিক মাত্রাতেই কাঁপছে। আমি তব্দা খেয়ে বসে পড়লাম! লাশটাকে ভাল করে দেখছি, নিথর দেহ, মুখটা হা হয়ে আছে কপালে বেশ মাত্রার ঘাম, সুঠাম দেহের একজন সাদাশার্ট লাল টাই আর ব্রাউন কালারের সু পড়ে একটি দেহ মাটিতে পড়ে আছে। দৃষ্টি মনা মিয়ার দিকে দিতেই দেখতে পেলাম মনার চোখে পৈশাচিক আনন্দের ছাপ। চোখ দুটো মুক্তোর মত উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে একটা গর্বের হাসি দিলো। মনে হচ্ছে আমি খুউব মহৎ কাজটাজ করে ফেলেছি। যা নিয়ে আসলেই গর্ব করা যায়। আর মনা মিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে সে একজন গর্বিত শিক্ষক। চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে তার! ঠিক এরকম চেহারা দেখেছিলাম উজানপুর প্রাইমারি স্কুলের দিলীপ মাস্টারের মুখে। মাস্টারমশাই ডাকটা আজকাল শুনা না গেলেও, প্রবীণ দিলীপ মহাশয়কে সবাই মাস্টারমশাই বলেই ডাকতেন। কেন কি কারণে তার এই নামকরণ সেটা আজও জানিনা। সেবার যখন শহর থেকে একজন মস্তবড় শিক্ষক এসে আমায় মানসাঙ্ক ধরেছিল তখন ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পেরেছিলাম বলে মাস্টারমশাই এর কি গর্বিত মুখ হয়েছিল! আহা! সে মুখ দেখার সৌভাগ্য আমার আর কখনোই হয়ে ওঠেনি। রমার সাথে পরিচয়টাও আমার ওই প্রাইমারি স্কুলেই। মেয়েটা তখন ফ্যাকাশে ইউনিফর্ম পড়ে আসতো চুলে বেণী করে। টিং টিং করে লাফিয়ে বেড়াতো। অসাধারণ একটা প্রতিভা ছিল মেয়েটার মধ্যে, দড়িলাফ প্রতিযোগিতায় কেউ কখনোই ওকে হারাতে পারেনি। সবসময় ওকেই পুরস্কার নিতে দেখা গেছে। আর মোরগ লড়াই প্রতিযোগিতায় সবার আগে বাদ পড়ে যাওয়া মানুষটা ছিলাম আমি! এ নিয়ে বাসায় ফেরার পথে কত্তবার যে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতো। একবার রাগ করে দিয়েছিলাম ধাক্কা। হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল জামগাছের গোড়ায়। কিসে যেন আঘাত পেয়ে কপাল গিয়েছিল কেটে! আমিতো ভয়ে একেবারে পড়িমরি করে দিলাম দৌড়। মেয়েটার সে কি গগনবিদারী চিৎকার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই ঘটনাটা ও কাউকেই বলেনি। সবাইকে বলেছিল ফেরার পথে পিছল খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। অথচ কেউ বুঝলোইনা এই ভরা রোদ্দুরে কি করে পিছল খেলো মেয়েটি! দুরন্ত মেয়ে ছিল বলে খুব একটা অবিশ্বাসও করতে পারেনি কেউ।

"ওই মিয়া বাইচে আছো নি? কি দেখতাছো এত্ত?"

মনা মিয়ার ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে নিজেকে আবিষ্কার করলাম শফিক সাহেবের ডাইনিং রুমে! উজানতলী থেকে সোজা উত্তরার ৯ নাম্বার সেক্টরে হারিয়ে গেলাম। মনা মিয়ার মুখের গর্বিত ভাবটা উবে গেছে, মাস্টারমশাই এর সাথে মিল খুঁজতে গিয়ে এখন

আবিষ্কার করলাম এই কুৎসিত হাসিজড়িত চেহারাটার সাথে বিন্দুমাত্র মিল নেই! এত্ত বিচ্ছিরি হাসি কখনোই মাস্টার মশাইয়ের হতে পারেনা।

মনা মিয়া নিজ মনেই বিড়বিড় করে যাচ্ছিলো।

"লাশটারে বুড়িগঙ্গার ধারে নিয়া দিমু ফেইলা। যাকগা। রহমান ব্যাটার কাছেরতে ট্যাহাটা নিয়া বাড়িত যামুগা। বউডা ক্যামবায় আছে কেডায় জানে!"

হুট করে নিতাই চলে আসলো ছুড়ি হাতে। হাতভর্তি গরম তাজা রক্ত। আমার দিকে তাকিয়ে আছে বিজয়ীর দৃষ্টিতে। মুখে একটা সূচালো হাসি। মনা মিয়ার দিকে তাকিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল "কি মনা মিয়া পোলাডা কিরাম? টেরেনিং এক্কেরে কড়া করে দেছিলাম তো, কিরাম কাম করলো?"

মনা মিয়া লাশটা গুছাতে গুছাতেই বলল "জবর একখান আনছো মিয়া, এইডা এর পরথম থাবা দেইখখা কেউই কইবোনা, ঝাক্কাস চিজ এক্কেরে"

আমিও হুট করে আবিষ্কার করলাম এটা আমার প্রথম হত্যা! একদম প্রথম হত্যা! আমি জানি খুন জিনিসটা খারাপ, মাস্টারমশাই যখন যুদ্ধের গল্প শুনাতেন তখন তিনি একটা কথা রোজ বলতেন যে "মানুষ মারোন তো ভালো কাম না বাবারা! এডি জালেমের কাজ জালেমের!"

অথচ আর তার খানিককালের প্রিয় ছাত্রটিই একটি জীবন কেড়ে নিলো। অবশ্য তারই আরেক ছাত্রীর জীবন বাঁচানোর তাগিদে কিংবা সাজানোর মানসেই এই প্রচেষ্টা সেটা সে মুখ ফুটে বলতে পারলোনা! রমাকে দালাল রানার কাছে থেকে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে সাড়ে চার লাখ টাকা দেয়া হয়। আমি চমকিত হয়ে বসে ছিলাম টাকার অংকটা শুনে। এই বিষাক্ত শহরে যে আমি রমাকে এই অবস্থায় খুঁজে পাবো সেটা কে ই বা জানতো?

মধ্যপাড়ার রতন চাওয়ালার সাথে যখন পল্লীতে গিয়েছিলাম তখন এই রানাই আমাকে রমার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমি এসব জায়গায় কখনোই যেতে সাহস করিনি। সেদিন রতন একদম জোর করে নিয়ে হাজির, রানার সাথে যোগাযোগটাও ওই করেছিল। আমি গিয়ে দেখি রমা মেয়েটা বসে আছে চোখ নিচু করে। দুবছর আগে যখন ওকে শেষ দেখেছিলাম তখন চেহারায় এত্ত মায়াবী উজ্জ্বলতা ছিল যেটা আজ মেকাপের আড়ালে এক দুঃখী সত্ত্বাকে ধারণ করে আছে। আমি থমকে গিয়েছিলাম, কাছে যেতেই রমা আমায় চিনতে পারলো! সে কি হাউমাউ করে কান্না মেয়েটার! আমি তখনও জানতাম না কিভাবে কি করব, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত ছিলাম যে আর যাইহোক ওকে ওখান থেকে আনবো। শুনেছি এটা নাকি এ শহরের অতিসাধারণ ঘটনা, অথচ রমা আমার কাছে কোনো সাধারণ কেউ ছিলনা। নেহাৎ পারিবারিক কারণেই হোক কিংবা অর্থ, কথাগুলো কখনোই ওকে বলা হয়নি। যাইহোক আমি ওখান থেকে এসেই নিতাইকে সব বলি, নিতাই তখন ওর সাথে কাজ করার আহবান জানায়। আমি নারাজ ছিলাম। কিন্তু পকেটে পয়সার চাহিদা বেড়ে গেলে হিতাহিত জ্ঞানটা মরে যায়। বেঁচে থাকে কেবল চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা! আর সেসব বেঁচে থাকা জিনিস ভাবতে ভাবতেই আজ এই কাজে এসেছি।

"এ নিত্তাই, চল লয়া যাইগা, এইহানে এডি রাখন ঠিক হইতোনা, কহন কে আসে কওন যায়না, ল যাইগা।" নিতাইকে কথাটা বলেই মনা মিয়া শফিক সাহেবের লাশটা প্যাকেটে পুড়ে ফেলল অর্ধেকটা। আমি তখনো কম্পনরত অবস্থায় বসে আছি। নিতাই পানির জগটা হাতে ধরিয়ে বলল "এই ল পানি খা।" জগটা ধরে দেখি আশপাশে রক্তের ছড়াছড়ি কিন্তু পানিটা পরিষ্কার। ঢকঢক করে খেয়ে নিলাম। দূরের আয়নায় নিজেকে দেখে রক্তপিপাসু সত্ত্বা মনে হচ্ছে! প্রচন্ড অস্বস্তি লাগা শুরু হলো। হুট করে কিসের যেন একটা আওয়াজ পেলাম, ঠিক বুঝে উঠলাম না এই মৃত ময়দানে বাজি কে ফুটাচ্ছে? নিতাই নাকি মনা মিয়া? খেয়াল করলাম বাম পা দিয়ে রক্ত পড়ছে আর কিছুটা গর্ত হয়ে কিছু একটা গেঁথে আছে। উপরের দিকে তাকাতেই দেখি নিতাই দৌড়ে পালাচ্ছে, মনা মিয়া প্যাকেট ফেলে দৌড়োচ্ছে। ওরা কোথায় যাচ্ছে? এসব কিছু বুঝে উঠার আগেই বুকে একটা কি যেন বিঁধলো। হাত দিয়ে গরম রক্তের অস্তিত্ব টের পেলাম। ধপাস করে শফিক সাহেবের মতন আমার দেহটাও পড়ে গেলো! পড়ে যাওয়ার আগে নীল পোশাকের ক'জনকে দেখলাম। আমার দিকে ছুটে আসতে। আচ্ছা তারমানে কি পুলিশ চলে এসেছে? মনা মিয়া তারমানে এদের নিয়েই ভড়কে ছিল?! তারমানে কি আমি মারা যাচ্ছি! রমা? রমার কি হবে? রমা কী করবে? ওকে কে জানাবে আমি মরে গেছি? ওকে কে বলবে যে সব আশা ছেড়ে দিতে? যেভাবে আছে সেভাবে থাকার চেষ্টা করতে ওকে কে বলবে? কে জানাবে? কে?

এস আই মনির সাহেব এসে দেখলেন দুটো লাশ পড়ে আছে। একটা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শফিক সাহেবের, যেটি প্যাকেটে অর্ধেক মোড়ানো। আর পাশেই পড়ে আছে এনকাউন্টারে মরে যাওয়া একটি অপরিচিত লাশ। মনির সাহেব যেটা দেখলেন সেটা হল একটি ভুসভুসে জিন্স পড়া কালো শার্টের চোয়ালভাঙা একটি প্রাণহীন সত্ত্বা যার বুকে জমে আছে তাজা রক্ত! অথচ তিনি বুঝতেই পারলেন না যে শুধুমাত্র একটি লাশই মরে পড়ে রয়নি, মরে পড়ে আছে কিছু স্বপ্ন, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, প্রিয়তমাকে নিয়ে জীবনযাপন করার ইচ্ছা, এবং মরে পড়ে আছে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ।

God

Md. Rakib Hasan Rabbi
Department of English, Session : 2017-18

Do you know where the God is?
Whom we never saw, never we talked.
Look around to find His existence
You can see, hear and feel his presence.

You will find Him in the silent rivers rushing,
You can feel Him in the wind harmoniously brushing,
You can see Him in the calmy quiet clouds,
You can hear Him in the rains jingle-jangles.
Do you know where the God is?
You can find Him in the love of mother,
You can find Him in the innocence of younger,
You can feel Him in the fragrance of flower,
You can hear Him in the hic of shower.
Do you know where the God is?
You can find Him in the wrinkled face,
You can see Him in the life of race,
You can feel Him in the playful breeze,
You can hear Him in the noiseless night time.

Do you know where the God is?
You can find Him in the strength of mountains,
You can see Him in the beauty of butterflies,
You can feel Him in the warmth of sun shines,
You can hear Him in the roar of oceans.
Don’t search God through illusions,
Don’t make any depiction,
Don’t create any confusion,
Don’t do any disorganization.
Do you know where the God is?
You can find Him into you,
Can see Him in your soul print view,
You can feel Him into you,
Can hear Him when your heart beat blew.

আফ্রিকার সিংহ রুয়ান্ডা বনাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশ

মেজর এরশাদ মনসুর, ইবি
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (এস্টেট), চিফ প্লানিং, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস

পূর্ব আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডা ভ্রমণের ইচ্ছে ছিল অনেক দিনের। ভ্রমণের চেয়ে দেখার ইচ্ছেটা ছিল খুব প্রবল। আমার আগ্রহের ক্ষেত্রগুলি ভালো করে দেখার। আর কোন যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় এই দেশটি জিরো না মাইনাস থেকে হিরো হল তা জানার। সেই ইচ্ছেটা পূরণের জন্য পুরো ভ্রমণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে নির্দিষ্ট দিনক্ষণের জন্য অপেক্ষা শেষ হল।

দেশ দেখার নেশা আমার পুরানো। এ ব্যাপারে খুঁটিনাটি অনেক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আমি ভ্রমণের আগে ছোটখাটো একটা গবেষণা করে ফেলি। রুয়ান্ডা ভ্রমণের ক্ষেত্রেও আমি তার ব্যতয় করিনি।

বিবিধ কারণে এই দেশটির ব্যাপারে অনেক শ্রেণির মানুষ ও গোষ্ঠীর আগ্রহের শেষ নেই। তা হোক ভূ-রাজনৈতিক, আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক বা জাতিগত সংঘাতের কারণে ১৯৯৪ সালের জঘন্য গণহত্যার কারণে। কিংবা, অনেক রক্তের বন্যা পেড়িয়ে দীর্ঘদিনের জাতিগত বিভেদ দূর করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আফ্রিকার এই দেশটি এতো দ্রুত কিভাবে অর্থনৈতিকভাবে মহা শক্তিধর দেশ হিসাবে আবির্ভূত হল সেই কারণে।

রুয়ান্ডায় দেখার পরিকল্পনা করেছিলাম একদম ভিন্নভাবে। সড়কপথে রুয়ান্ডায় পশ্চিমে অবস্থিত পূর্ব আফ্রিকার আরেক দেশ 'ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো (ডিআরসি)'র সীমান্তবর্তী শহর গোমা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম রুয়ান্ডায়। সীমান্ত থেকে এই দেশটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার পরিকল্পনা করেছিলাম।

পহেলা জানুয়ারি সকালে ডিআরসির ইমিগ্রেশন পোস্টের কাজ শেষ করে রুয়ান্ডার ইমিগ্রেশন অফিসে প্রবেশ করতেই দায়িত্বরত কর্মকর্তা সেদেশের প্রেসিডেন্ট এর পক্ষ থেকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড উপহার দিলেন। সাথে এক গুচ্ছ তাজা ফুল। বেশ অবাক হয়ে আশেপাশে তাকিয়ে ঘটনা বুঝার চেষ্টা করলাম। মনে হলো বিশেষ কোন ব্যক্তির সাথে তালগোল পাকিয়ে ভুল করে আমার জন্য এমন বিশেষ খাতির-যত্নের আয়োজন। চারিদিকে আরেকটু ভালো করে অন্যান্য পর্যটকদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সবার হাতেই নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড এবং ফুল। সবার জন্য দেশের প্রেসিডেন্ট এর পক্ষ থেকে তার স্বাক্ষর করা নববর্ষের কার্ড।

ততদিনে আমি প্রায় ৪০টা দেশ ভ্রমণ করেছি। কোন দেশের ইমিগ্রেশন অফিসের কর্মকর্তাদের নিকট থেকে এই ধরণের সারপ্রাইজ (না, অতি উন্নত মানের ভদ্রতা ও সামাজিকতা এবং জাতি হিসাবে উন্নত মানসিকতার পরিচয়) তো পাইইনি বরং সবুজ পাসপোর্টের কারণে কত জায়গায় ভোগান্তির সম্মুখীন হয়েছি তা না হয় নাই বললাম। দেশ হিসাবে রুয়ান্ডা, সেদেশের মানুষ এবং প্রেসিডেন্টের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো।

রুয়ান্ডার সীমান্ত থেকে যে সড়ক ধরে গাড়িতে করে রাজধানী কিগালি যাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল সেটা রাস্তা না, যেন বিমান বন্দরের রানওয়ে। মসৃণ, ভাঙা খানা-খন্দক নেই, সমতল এবং প্রশস্ত। রাস্তার দুই ধারে উন্নত দেশের মতো আধুনিক মানের ড্রেনেজ ব্যবস্থা। দু'পাশেই সাজানো গাছের সারি। সীমান্ত এলাকার রাস্তা এবং জল নিষ্কাশনের উন্নতমান এবং ব্যবস্থা দেখে ভাবছিলাম এদেশের রাজধানীর অবস্থা তাহলে কি হবে! তার মধ্যে রুয়ান্ডার অনেকটা অংশ পাহাড়ি। সেই পাহাড়ি এলাকার উন্নয়নের যা অবস্থা তা দেখে সত্যিই মন কেড়ে নেয়।

ভাবছিলাম আমার জন্য আরও কত বিস্ময় না সামনে অপেক্ষা করছে। সত্যি তাই! এদেশে আসার কারণ সেটাই। রাস্তার চারপাশে যতদূর চোখ যায় পাহাড়ের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা জুড়ে শুধু কৃষিকাজের সমাহার। ব্লক করা জায়গা ভাগ করে হরেক রকমের ফল, সবজি বা সাজানো অন্যান্য কৃষিজাত আবাদী জমি। মাঝে মাঝে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর মানুষের সাজানো সুন্দর ঘরবাড়িও চোখে পড়লো। সেই সাথে উন্নত দেশগুলির মতো বিদ্যুৎ সঞ্চালনের লাইন, পানির লাইন এবং অন্যান্য সেবামূলক ব্যবস্থার দৃশ্য দেখে নিজের অজান্তে আমাদের দেশের কথা চিন্তা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম!

একটু পর পর বিভিন্ন বয়সের প্রাণবন্ত ছেলেমেয়েদের গল্প করতে করতে স্কুল-কলেজে যাওয়ার দৃশ্য দেখছিলাম। আরও দেখছিলাম লোকালয়, বাজার-ঘাট, মার্কেট, মাঝারি মাপের ফ্যাক্টরি। সব কিছু যেন সাজানো গোছানো এবং একটা শৃঙ্খলার চাঁদরে আবদ্ধ। যতটুকু খেয়াল করছিলাম সবার মুখে একটা পরিতৃপ্তির ছাপ।

গোমা থেকে কিগালি পর্যন্ত প্রায় ১৭৫ কিঃ মিঃ দূরত্বের পুরোটাই উঁচু-নিচু পাহাড়ি রাস্তা, অনেক জায়গায় আছে পেঁচানো বাঁক। সড়কপথে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সাড়ে তিন ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা লাগে।

রুয়ান্ডার রাজধানী কিগালির যত কাছাকাছি আসছিলাম চারপাশে সব আধুনিক মানের বাড়িঘড়, স্থাপনা, অফিস-আদালত, মার্কেট, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি চোখে পড়ছিল। ঠিক যেমনটা দেখব আশা করেছিলাম। ভিতরে ভিতরে কৌতুহলটা বেড়েই চলছিল; এই যাদুর কাঠির পিছনের যাদুকর সম্পর্কে যা শুনে আসছিলাম তার কতটা সত্য তা নিজ চোখে দেখে নিশ্চিত হওয়ার এক অদম্য কৌতূহল!

আর, তখন মনে পড়ছিল হাজার হাজার মাইল দূরে ফেলে আসা প্রিয় মাতৃভূমি সোনার বাংলাদেশের কথা।

কিছুক্ষণের মধ্যে কিগালিতে প্রবেশ করলাম। ব্যস্ত নগরী। রাস্তা ঘাট বেশ প্রশস্ত। ইউরোপ বা আমেরিকার মতো উন্নত। ট্রাফিক ব্যবস্থা বেশ আধুনিক। রাস্তার দুই পাশে আছে পথিকের জন্য চওড়া পায়ে চলার ফুটপাথ।

বিভিন্ন অফিস, ব্যাংক, আবাসিক হোটেল, মার্কেট, ট্রাভেল এজেন্সি অফিস, ফাস্ট ফুড এর দোকান, দূরে কোথাও খেলার মাঠ, উঁচু উঁচু এপার্টমেন্ট সব কিছু আছে এই শহরে। অনেক উন্নত নির্মাণ শৈলীর ছাপ লক্ষ্য করলাম প্রতিটি স্থাপনায়। আছে বেশ আধুনিক মানের অনেক ভাস্কর্য। আছে থরে থরে সাজানো সবুজের সমাহার। চার রাস্তার মাঝে মাঝে আছে রঙ-বেরঙের আধুনিক ফোয়ারা। রাস্তার মোড় গুলো বেশ প্রশস্ত। রাস্তার পাশের বৈদ্যুতিক বাতির পোস্ট গুলো আধুনিক। কোন ঝুলন্ত তার চোখে পড়ল না। বুঝলাম সব তার মাটির নীচ দিয়ে বিছানো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে জমকালো বিলবোর্ড। বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক পণ্যের বা খাবারের বা সেবামূলক কোন বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড। অলিতে গলিতে আছে আন্তর্জাতিক চেইন ফাস্ট ফুড এর দোকান। মানুষের বাহন হিসাবে এই শহরে চোখে পড়লো ব্যক্তিগত গাড়ি, দু'চাকার মোটরযান, বাইসাইকেল এবং আধুনিক মানের শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত সিটি সার্ভিসের বাস। এখানে অনেকেই পায়ে হেঁটে যাতায়াত করে অভ্যস্ত।

কিগালি শহরে আছে অনেক আধুনিক নাইট ক্লাব। আছে অনেক বার। বিনোদনের জন্য এখানে আছে ইউরোপের অনেক শহরের মতো জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন। সন্ধ্যার পর এই শহর অন্য এক রূপ ধারণ করে। তবে, সেই রূপ মেনে চলে একটা শৃঙ্খলা এবং মাত্রা। আর এই রূপ এর খদ্দের হল মূলত বিদেশী পর্যটকেরা। এদেশের মানুষ বেশ স্বচ্ছল। তবে সীমাহীন ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দেয়ার মতো নয় এরা। বিনোদনের ভারে শনিবার রাতে এই শহর একটু মাত্রা ছাড়িয়ে কেমন যেন পাগল পাগল হয়ে যায়।

রুয়ান্ডায় আমি সপ্তাহ খানেক ছিলাম। মোটামুটি মানের একটা হোটেলে। এখানকার খাওয়া-দাওয়া স্বভাবতই আমাদের রুচির সাথে যায় না। আফ্রিকার প্রধান খাবার কাসাবা। মাটির নীচে হয় এমন এক ধরনের আলু কাসাবা। শুকিয়ে গুড়া করার পর কাই বানিয়ে বা অন্য খাবার বানিয়ে কাসাবা খায় এখানকার মানুষ। সাথে শিম, আলু, কখনও মাছ বা মাংস খায় এখানকার মানুষ। বিভিন্ন ফলমূলও খায় তারা। আর ওয়েস্টার্ন, ইউরোপীয়, ভারতীয় বা মধ্যপ্রাচ্যের লেবানিজ খাবারও এখানে পাওয়া যায়। আমি একেকদিন একেক দেশীয় খাবার খেয়েছি এখানে।

এদেশের জাতীয় এবং মানুষের গড় আয় বেশ ভালো। তাই এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর দাম অনেকটা উন্নত দেশের মতো। এদেশের মুদ্রার নাম ফ্রাংক। সেসময় এক ইউ এস ডলার এর বিনিময়ে প্রায় ৬০০ ফ্রাংক পাওয়া যেত।

১৯৯৪ সালে এদেশের প্রধান দুই প্রতিদন্দ্বি গোত্র হুতু এবং তুতসিদের মধ্যে যে জাতিগত গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিলো; তাতে প্রায় আট লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলো। তার বেশিরভাগ ছিল তুতসি গোত্রের মানুষ। যারা শিক্ষা-দীক্ষা, ধন সম্পদে এবং প্রভাব প্রতিপত্তিতে পিছিয়ে ছিল। এই গৃহযুদ্ধের পিছনে আন্তর্জাতিক মহলের ইন্ধন এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হাত ছিল।

এই যুদ্ধের প্রভাব এবং পরবর্তী ফলাফল বর্ণনা করতে গেলে আমার লেখা অনেক বড় হয়ে যাবে। আমার উদ্দেশ্য অন্য। সেই ইতিহাস রচনা করা না। তবে সেই ইতিহাসের চুম্বক অংশটা আমার লেখার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুদ্ধের পর অত্যাচারিত তুতসি গোত্র ক্ষমতায় আসে। ধীরে ধীরে তুতসিরা প্রাক্তন শাসক শ্রেণি হুতুদের ক্ষমা করে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করে দেশের উন্নয়নের একটা বড় অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

সব ভেদাভেদ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, অত্যাচার, অনাচার ভুলে গিয়ে আজ হুতু এবং তুতসিরা একসাথে মিলে মিশে রুয়ান্ডাকে আফ্রিকার সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতিতে পরিণত করেছে।

মানুষ ফেরেশতা না। শতভাগ বিভেদ বা অবিশ্বাস হয়তো দূর হয়নি। কিন্তু যতটা হয়েছে, চিন্তার বা ভাবনার বা আশার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। হুতুদের অনেকেই আজ পাশের দেশ ডিআরসি'তে পরবাসী হয়ে থাকছে। বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। আমি সে আলোচনায় যাবো না। আঞ্চলিক অনেক রাজনীতির আলোচনায়ও আমি যাবো না।

আমি কিগালিতে অবস্থিত গণহত্যার যাদুঘর এর বিষয়ে আলোচনা করবো না। আমি হোটেল রুয়ান্ডার কথাও আলোচনা করবো না। আমি এদেশের অশান্ত ইতিহাসের কথাও আলোচনা করবো না।

আমি আলোচনা করতে চাই সেই জাদুকরের যাদুর কথা। যার যাদুর কাঠিতে রুয়ান্ডা আজ অনেক শক্তিশালী। তার নাম পওল কাগামে। ২০০০ সাল থেকে তিনি রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট। একজন মহা যাদুকর। ষাট বছর বয়সী এই যাদুকর ভগ্নপ্রায় দেশকে আজ যেখানে নিয়ে এসেছেন তার দৃষ্টান্ত নিকট অতীতে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবেনা বলে আমার বিশ্বাস।

দূরদর্শীতা, কঠিন দেশপ্রেম, প্রজ্ঞা, সাহস, ধীর-স্থির মানসিকতা, ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে অভিজ্ঞ, দৃঢ়তাসহ এমন ডজন ডজন গুনে গুণান্বিত এই নেতার একক অবদানে রুয়ান্ডা আজ শুধু একটা আদর্শ, শক্তিশালী, স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে না, উন্নত জাতি হিসাবেও পৃথিবীর কাছে পরিচিত।

পওল কাগামে সম্বন্ধে জানার জন্য ঘটনাচক্রে সরকারের কয়েকজন কর্মকর্তা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে কথা বলে তার নেতৃত্বের বহুমুখী প্রতিভার কথা জানতে পারি। তিনি এমন একজন নেতা যার কথা সবার মুখে মুখে।

তার আশ্বাসে অসাধু ধনী ব্যক্তিরা বিদেশে পাচার করা লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার দেশে এনে বিভিন্ন মানব কল্যাণ, শিক্ষা, অর্থনৈতিক, সামরিক, উন্নয়ন মূলক, অবকাঠামো, উৎপাদন এবং বিবিধ খাতে বিনিয়োগ করেছিলেন। তিনি সেই সব অসাধু অর্থ সম্পদের মালিকদের আইনিসহ সকল রকম নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি তাঁদের বিনিয়োগ এবং লাভের নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে ভগ্নপ্রায় দেশকে এই পর্যায়ে আনতে পওল কাগামে খুব কম বিদেশি আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

পাশাপাশি সকল আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক অপ-রাজনৈতিক বাঁধা, আক্রমন, চাপ মোকাবেলা করে তিনি জাতিকে একতাবদ্ধ করে লক্ষের দিকে এগিয়ে গেছেন।

তিনি দুর্নীতিবাজ কোন রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, আমলা, ব্যবসায়ী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, যে কোন পেশার ব্যক্তি সে যেই পর্যায়েরই হোকনা কেন এমনকি তার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়কেও প্রশ্রয় তো দেনইনি বরং কেউ দুর্নীতির কারণে চিহ্নিত হলেই তাকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন।

অনেকে তাকে বলেন একনায়ক। এমন একনায়ক দরকার দেশে দেশে।

বাংলাদেশ ও আমার বাংলাদেশ - কবে তুমি পাবে এমন একজন একনায়ক।

যিনি শুধু নিজে সৎ থাকবেন না - আশেপাশের, কাছের, দূরের সব দুর্নীতিবাজদের পরিশুদ্ধ করবেন দেশপ্রেমের আদর্শে, রাহুমুক্ত করবেন দুর্নীতির মহা পাপ থেকে।

নীল অপরাজিতা এবং বৃষ্টি

আমিনা রহমান দৃষ্টি
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯

"এইযে মৃন্ময়ী?"

খুব বিরক্তি নিয়ে পিছনে তাকালো নীনা, কে যেন কাকে ডাকছে অনেক্ষণ ধরে, "আমাকে বলছেন?"

"তো আপনাকে ছাড়া আর কাকে, আশেপাশে এরকম নীল শাড়ি পরা আর কে আছে?"

এরকম অদ্ভুত যুক্তির কাছে আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে নীনা বলল, "কিন্তু আমার নাম তো মৃন্ময়ী না! আমি কীভাবে বুঝব যে আমাকেই ডাকছেন!"

"এরকম নীল শাড়ি পরলে সে মৃন্ময়ীইইইইই হয়ে যায়, তো মৃন্ময়ী এভাবে মুখ গোমড়া করে থাকবেন না, মৃন্ময়ীরা মুখ গোমড়া করে থাকে না"

কিছু বলার আগেই ছেলেটা চলে গেলো, অদ্ভুত তো!

"এই যে শুভ্রা? আপনাকেই বলছি"

চায়ের কাপ হাতে ঘুরে তাকাল নীনা, আবার কালকের ছেলেটা!

"সাদা শাড়িতে আপনাকে ঠিক শুভ্রাই মনে হচ্ছে!"

তারপর একগাল দিকভ্রান্ত হাসি হেসে উলটো ঘুরে হাঁটা দিলো ছেলেটা, "আজব তো!"

"আরে এই যে বাসন্তী, এরকম হাসতে পারেন না সবসময়? হাসলে কিন্তু আপনাকে খুব সুন্দর লাগে"

"আচ্ছা দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনার সমস্যা টা কি?"

"আমার আবার কি সমস্যা!"

"এই যে আমি যেদিন যে রঙের শাড়ি পরি সেদিন সেরকম একটা নামে ডাকেন, আমার তো একটা ফিক্সড নাম আছে নাকি!"

"যেদিন যেরকম শাড়ি পরেন সেদিন আপনাকে সেরকম লাগে, তাই সেদিন সেরকম নামে ডাকি"

"কিন্তু অনেক রকম রঙ তো নাম দেয়ার মত থাকে না, যেমন কালো, তখন?"

"কালো? কেনো রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি!"

আবার সেই অগোছালো হাসিটা!

নীনা একটু থমকে দাঁড়িয়ে থাকলো, তারপর দেখে সামনের ভিড়ের মাঝে ছেলেটা হারিয়ে গেছে!

"ভীষণ অদ্ভুত ছেলে তো"...

অনেকদিন পর আজকে নীল আর সবুজ শাড়ি পরেছে নীনা, আনমনে হলেও খুঁজছে সেই অদ্ভুত ছেলেটাকে...কিন্তু কেউ অন্য কোন নামে ডেকে উঠলো না...নীনার বেশ একটু অকারণ মন খারাপ হয়ে গেলো....

তারপর হঠাৎ করেই বৃষ্টি নামল, রাস্তা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না নীনার...আজ ভিজবে সে।

"এই যে অপরাজিতা, জানেন তো বৃষ্টির ফুল অপরাজিতা?"

ঘাড় ঘুরিয়ে নীনা তাকালো, ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে ছেলেটা হাসছে!

খুব বিচিত্র কোনো কারণে নীনা আবিষ্কার করল তার চোখের কোনায় জল!

ঠিক সেই মুহূর্তে ছেলেটা বলল, "চলুন অপরাজিতা, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাঁটি, হাঁটবেন তো আমার সাথে?!"

মাঝে মাঝে সময়কে বেঁধে রাখতে ইচ্ছে করে, নীনার এই মূহূর্তে এই অবাস্তব ইচ্ছেটাই খুব বেশি করে করছে!

The Mustard Umbrella

Tasnim Naz
Department of English, Session : 2016-17

I pulled the umbrella closer to my body as the rain howled outside. The rain seemed to be coming in waves, once from the left and then changing directions to the right. At any other circumstances, I would have welcomed the rain with all its eccentricities. But not today.

I stood hurled up on a bus stand shade. The roof over our top was a flimsy looking cover, with holes and decay all over. As the rain changed directions again, I slanted my umbrella the other way to protect myself from the untamed rain. Too many people stood on the bus stand waiting for a bus that never seemed to arrive. Some, I believed, were just standing there to protect themselves from this downpour. I was muddy and wet, I checked my watch, it was 12:15 pm and I was late for class.

An old man, easily in his 60's, power walked his way towards the bus stand. 'Great' I thought, 'one more addition to the dysfunctional family.' He looked around the stand helplessly, as if trying to identify a long distant dream. He shivered ever so slightly and his eyes were red rimmed. He snuffled in regular interval and our eyes met. As he approached me, the rain changed directions once more and a wave of raindrops flooded the bus stand.

'Excuse me miss,' he said 'could I ask you for an unusual favor?'

I pulled my umbrella closer to me and processed the situation. The old man kept looking up at my umbrella earnestly.

'What is it?' I asked him.

He pulled out a faded white handkerchief and rubbed his nose with it. 'If it isn't too much trouble, could you lend me your umbrella?'

I thought the man must have been insane. A total stranger, asking for such a favor. And this umbrella of all things. I looked up at my faded mustard umbrella, embellished with aboriginal patterns. A gift my mother gave me on my birthday three years ago. An umbrella was an unconventional birthday gift for sure, but my mother was wonderfully bizarre. On her death-bed, she had asked me to remember her each time I opened this mustard umbrella. That she would always protect me, like the umbrella does from the rain.

'There's no way' I thought. But the man did look so pale and sickly. I decided to give the old man a chance. 'The bus is going to arrive anytime, I'm sure. Maybe instead of walking, you could take the bus?'

He looked helpless. 'Please, this bus does not go to the same route as my home. If you could lend me your umbrella, I could walk ahead a little and maybe take a rickshaw.'

I looked around the busy highway for any signs of a rickshaw. There were none. 'Damn this rain' I thought. I looked at the old man and he looked back in eager anticipation. I said, 'You ask me to lend you my umbrella, how do you plan on returning it?'

Evidently, he was a little stumped. But, he gathered himself quickly and said, 'If you tell me your address, I could return the umbrella myself.'

'I'm sorry, but I cannot give out my address to a total stranger.'

At this point, the old man had a coughing fit. When he recovered, he looked like he had aged ten years. The red around his eyes seemed brighter. He shivered more visibly. The old man was falling ill. I looked up at my umbrella again and sighed. The umbrella seemed to tell me, 'You know what to do, do the right thing.'

I closed the umbrella with a heavy heart and handed it over to the old man, 'I travel by this bus every day for classes. If you want to return the umbrella, you'll find me here around 12pm.' He took the umbrella, thanked me vigorously and walked away. It hurt to give up the umbrella, I prayed with all my heart that the old man would return the umbrella, that this wasn't just an elaborate scam. As if to appease my heart, the bus finally arrived.

A week passed away sluggishly, and there was no sign of the old man or my umbrella. The first few days, I furiously blamed the old cheat. But as days progressed I told myself that a part of me knew as soon as I had handed him the umbrella, that it was gone. Two weeks passed and the events of that rainy day became a distant memory. On the third week since the incident, another rainy day, I stood on the bus stand waiting for the bus. I clutched a bland black umbrella in my hands, leaps and bounds from my favorite mustard one.

I looked around the bus stand and spotted a disheveled looking old woman sitting in one of the muddy seats of the stand. She wore a ragged looking white saree and was inquisitively looking around the crowd of people in the stand. There was deep sadness in her eyes, they were heavy and puffy. Something drew me to this woman, I was hypnotized. She clutched something yellow in her hands and upon closer inspection, I recognized my mustard umbrella. I walked towards her and said, 'Excuse me, that's my umbrella.'

The woman looked up at me and stretched her hand out, giving me the umbrella. She did not question it and said with a tired voice, 'My husband left this note for you. He asked me to give it to you.' I took the note and opened it. In a clumsy handwriting it said,

"Thank you for lending me this fantastic umbrella. I know it was special to you. I wish I could give it back to you myself, with proper thanks. Remember this stranger each time you open the umbrella."

The bus finally arrived. The crowd of people hurried off to the bus, eager to get out of this atrocious rain. The bus stand lay empty. It rushed off, leaving me and the old woman alone in the stand. I took a seat beside her, clutching onto the mustard umbrella and the note in my hands, staring out into the pouring rain.

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপরেখা

আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী (তমাল)
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

সংস্কৃতি সভ্যতার বাহন। সমাজ জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তুলে সংস্কৃতি মানব জীবনের ভিত্তি রচনা করে। আদিম সমাজ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সভ্যতার উৎপত্তি, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে সংস্কৃতির অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত জীবন প্রণালী সাংস্কৃতিক গতিকে সচল রেখেছে। সংস্কৃতির পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। ইংরেজি Culture শব্দের প্রতিশব্দ হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবন পদ্ধতি। ক্ষুদ্রতর অর্থে সংস্কৃতি বলতে বুঝায় মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজনিত উৎকর্ষ। কোন সমাজের সংস্কৃতি বলতে ঐ সমাজের প্রচলিত জীবন প্রণালীকে বুঝানো হয়। তবে সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানী টেইলর (Tylor) কালচার বা সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society."

অন্যদিকে বোয়াস বলেন, "কোন এক সমাজের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান, উহার প্রতি ব্যক্তি বিশেষে প্রতিক্রিয়া এবং সর্বোপরি ঐ সবের ফলশ্রুতিকে একযোগে লোকসমষ্টির কালচার বা সংস্কৃতি বলা হয়।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতির যে অর্থ ফুটে ওঠে তা হলো "Culture is the way of life" এই আলোকে আমরা যদি বাংলাদেশের সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে যাই তাহলে বাঙালি সংস্কৃতি বলতে এখানকার মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রণালীকেই বুঝিয়ে থাকে। অর্থাৎ বাঙালি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষের জীবন প্রণালী বাঙালি সংস্কৃতি। বাঙালি জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের প্রধান বাহন হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে থাকে জমি ও কৃষি। সেই অর্থে কৃষি সমাজের ঐতিহ্যই বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য। কিন্তু কৃষি সমাজের এই যে ঐতিহ্য তার শেকড় কোথায়? এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গিয়েই বেরিয়ে আসবে বাঙালি সংস্কৃতির উৎস। শুধু তাই নয়, সংস্কৃতিতে যে স্বাতন্ত্রতা এই বাংলার রয়েছে তাও প্রতিয়মান হয়ে উঠবে এই প্রবন্ধের মাধ্যমে। মূলত বাঙালি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য খুঁজে বের করাই থাকবে এই অনুসন্ধানী প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য বা প্রয়াস।

বাঙালি সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের সন্ধানে যে বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন তা হলো, আমরা প্রকৃতপক্ষে কারা, আমরা কোথা থেকে এসেছি সেই অর্থে জাতিগত পরিচয়, কোন ভাষায় কথা বলি, কী আমাদের খাবার তালিকা এবং আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রার স্বরূপটা কি ধরনের বা এই জীবনযাত্রা কি উপাদান দ্বারা পরিচালিত ও প্রভাবিত হচ্ছে। এই অনুসন্ধানে যাবার আগে যে বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করার আবশ্যকতা অনুভব করছি। যথা এই জাতির জাতিগত ও গোষ্ঠীগত উপাদান, আকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রভাব, ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষাগত উপাদানের সমন্বয়, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রভাব, অর্থনৈতিক জীবনপ্রণালি, রাজনৈতিক উপাদান, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ ও জাতীয়তাবাদ।

বাংলাদেশের অধিবাসীর মধ্যে আদি অস্ট্রেলীয় প্রভাব বিদ্যমান যাদের এখন বলা হয় ভেড্ডিড। এরাই নাকি এ অঞ্চলের অন্যতম আদিবাসী। সিংহলের ভেড্ডাদের মতো দেখতে এই ভেড্ডাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হলো লম্বাকৃতির মাথা, চওড়া নাক এবং গায়ের রং কালো। গড়নে বেঁটে বা মধ্যমাকৃতির। এদের প্রভাব সাঁওতাল এবং ওঁরাওদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি বাঙালি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে এই ভেড্ডিড উপাদান রয়েছে বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে ধারণা করা হয় আদিবাসীরা ছিল দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। রিজলে তার "Tribes and Castes of Bengal" গ্রন্থে বাঙালিদের নরগোষ্ঠীগত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, বাঙালিরা মঙ্গোল-দ্রাবিড় প্রভাবিত এক শংকর জনগোষ্ঠী। এছাড়া ডঃ নূরুল ইসলাম তার 'Cultural Heritage of Bangladesh in Search of National Entity' প্রবন্ধে বলেন, উত্তর ভারতে তথা আর্যাবত থেকে অনার্য বা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী আর্য দখলকারীদের দ্বারা দক্ষিণ ও পূর্বদিকে বিতাড়িত হয়। জাতিগতভাবে এরা

ছিল প্রো-অস্ট্রেলয়েড যাদেরকে নিষাদ (Nishad) আর মঙ্গোলীয় যাদেরকে কিরাত (Kirat) বলা হতো। এরা ছিল প্রধানত কৃষিজীবী। আর্যদের নিকট এদের পরাজিত হওয়ার প্রধান কারণ ছিল আর্যরা অকৃষিজ জাতি। তাদের বাহন ছিল ঘোড়া এবং তারা বহুল পরিমাণে লোহার ব্যবহার জানত। তাদের ভাষা ছিল উন্নত। পরবর্তীতে ইসলামের আগমণের সাথে কিছু সেমিটিক জনগোষ্ঠীও বাংলার জনগোষ্ঠীর সাথে মিশ্রিত হয় বিশেষ করে উপকূল এলাকায়। মোট কথা শংকরায়নের ফলে বাঙালি জাতির নরগোষ্ঠীগত পরিচয় বেশ স্বতন্ত্র।

সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমলে বাংলার বিভিন্ন জনপদে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে অখন্ড ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় সত্ত্বায় আবদ্ধ হয়। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান মোটামুটি ২০.৩৫ ও ২৬.৭৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.৩ ও ৯২.৭৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। একজন ও এক ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজকের যে বাংলাদেশ তার চারিদিকে রয়েছে সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক সীমানা। রাষ্ট্রের সীমারেখা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হলেও প্রাকৃতিক সীমানা ঠিকই থাকে। প্রধানত বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জাতির অখণ্ড বাসভূমি বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিধাতাদের হাতে খণ্ডবিখণ্ড হলেও তার প্রাকৃতিক সীমারেখার বদল হয়নি। বাংলাদেশের ভৌগলিক স্বতন্ত্রতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডঃ নূরুল ইসলাম বলেন, হিমালয় এবং অন্যান্য গিরি শ্রেণি থেকে উদ্ভুত অসংখ্য নদ-নদী মাকড়শার জালের মত জড়িয়ে আছে বাংলাদেশে। এদের বয়ে আনা কাঁকড় বালি আর পলি দিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের অববাহিকা যা সম্ভবত পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ সমভূমি অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়, মধুপুর গড়, লালমাই আর বরেন্দ্রভূমি ব্যতীত দেশের ভূমির গড় উচ্চতা সমুদ্রতর থেকে ১৫-২০ ফুটের বেশি নয়। বাংলার এ ভূ-প্রকৃতি উপমহাদেশের অন্যান্য অংশ থেকে কিছুটা ভিন্ন। ভারতের যেমন ভারত মহাসাগর তেমনি বাংলাদেশেরও নিজস্ব বঙ্গোপসাগর আছে। বাংলার প্রাকৃতিক বলয় ও জলবায়ু বঙ্গোপসাগর দ্বারা প্রভাবিত। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প বাংলার সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উত্তরের পাহাড়রাজিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে তা বাংলার নদীনালা দিয়ে আবার বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। এভাবে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেই একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র স্বকীয়তা আছে। বাংলাদেশের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন এ বলয়ে আবর্তিত। উর্বর ভূমিতে ধান ফলে তাই প্রধান খাদ্য ভাত। নদ-নদী, জলাশয়, হাওর-বাওর, পুকুর ও খাল বিলে প্রচুর মাছ হয়; তাই ভাতের সাথে মাছ মিলিয়ে বাংলাদেশীদের প্রধান ঐতিহ্য মাছে-ভাতে বাঙালি। মোসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তর ভারতের মতো এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা সেচ নির্ভর ছিল না। তাই এখানে ভারতের অন্য অঞ্চলের মতো Oriental despotic গড়ে ওঠেনি। এখানে সুযোগ পেলেই স্বাধীন রাষ্ট্র নৃ-পতির উদ্ভব ঘটেছে যেমন সুলতানী যুগ বা বারো ভূঁইয়ার শাসন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের নাম প্রদেশ যেমন- উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ। আর বাংলাদেশ নামের দেশ যার শাব্দিক অর্থ Nation ষড়ঋতুর দেশ তাই বারো মাসে তের পার্বণ।

মানুষের স্বভাব চরিত্র ও মন মননশীলতা কখনও প্রকট নয়। এজন্য বাংলাদেশে কখনই নিগাড় জাতি বর্ণ প্রথা গড়ে উঠেনি। প্রকৃতির মতই এখানে সবাইকে সবাই আপন করে নেয়, সেজন্য বলা হয়, “বাংলায় আসার অনেক পথ, যাওয়ার পথ নেই।”

পৃথিবীর মধ্যে আমরাই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়েছি। যার ফলস্বরূপ আমাদের মাতৃভাষা দিবসকে বিশ্ব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গ্রহণ করেছে। এটি একদিকে আমাদের গর্বের বিষয়; অন্যদিকে এই জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে জাতিসংঘের নিকট। সেই সুলতানী আমল থেকেই বাংলা ভাষার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আর এই ভাষায় অতীতকাল থেকে বাউল, কবি, সাধক তাদের সৃষ্টিকে প্রকাশ করেছেন। তাই তারা আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আমাদের বাংলা ভাষার কিন্তু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনেকেই বলে থাকে মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলায় মনের ভাব যতটা নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করা যায়, অন্য কোন ভাষায় সেটা সম্ভব নয়। সাহিত্যকে সংস্কৃতির ধারক হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আমাদের সাহিত্যের মাঝেও আমরা আমাদের সংস্কৃতির প্রতিরূপ দেখতে পাই। জীবনানন্দ দাসের কবিতাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এদেশের স্বরূপ খুঁজে পাই। অন্যদিকে আমরা মূলত বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করি যার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে বৃহত্তর সমাজ ও মানুষকে পৃথিবীতে এক সুসভ্য মানব সমাজ গঠনের কাজে নিয়োজিত হতে পারি। এখানে অর্থাৎ এই বাংলায় ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা উপাদানের মধ্যে এক অপরূপ সমন্বয় সাধিত হয়েছে। আর্য ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে গৌতম বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার শুরু করেন। মৌর্য রাজ বংশের ব্যাপক তৎপরতায় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিলুপ্তি ঘটে। অবশ্য পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলী এই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়। তবে একথা সত্য বাংলাদেশে মুসলমানের আগমন পর্যন্ত বৌদ্ধ সমাজ মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮৭২ সালে এই অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যার প্রথম স্বরূপ ধরা পড়ে। ১৮৭২ এর প্রথম আদমশুমারীর পর দেখা যায় যে পূর্ববঙ্গে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের বাস। সে সময়ে কতক বৃটিশ প্রশাসক মন্তব্য করেন যে পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা নিম্ন বর্ণের হিন্দু অংশ থেকে ধর্মান্তরিত। এর প্রতিবাদে মুর্শীদাবাদের ফজলে রাব্বী

'হকিকতে মুসলমানানে বাংলা' বা বাঙালি মুসলমানদের উৎপত্তি শীর্ষক পুস্তিকা লেখেন যাতে তিনি উচ্চ বর্গের বাঙালি মুসলমানেরা উত্তর ভারত থেকে আগত এ অভিমত প্রচার করেন। তার মতে এভাবে বহু বহিরাগত মুসলমান, মুসলিম শাসনামলে স্রোতের ধারায় বাংলাদেশে এসেছিল। ফজলে রাব্বীর মন্তব্যকে পক্ষপাতশূন্য বলা যায় না। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কতক লেখক প্রশ্নটি দেখেছিলেন তার ভেতর হান্টারের "Annals of Rural Bengal এর কথা বলা যেতে পারে। তাতে মুসলমানেরা বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী অহিন্দু (নিম্ন বর্ণের হিন্দু নয়) জনসংখ্যা থেকেই বহুলাংশে ধর্মান্তরিত হয়েছিল এ মন্তব্য করেন।

বৌদ্ধ ধর্মের কঠোর অনুশীলন থেকে ইসলামের প্রচার ছিল অনেকটা সর্বজনীন ও উদারভিত্তিক। মূলত ইসলামের উদাত্ত আহ্বানে এই অঞ্চলের মানুষেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাই স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এই অঞ্চলে মুসলমানদের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কোনো সমাজের জীবনধারা অনেকটা ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন আমরা যদি আজকের ভারতকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রে হিন্দুদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বে ইউরোপ ও আমেরিকায় যদিও ধর্মের প্রভাব তেমন পরিলক্ষিত হয় না তারপরেও ঐ সকল দেশগুলোতে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং সেই সকল দেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও ধর্মীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সেই প্রেক্ষাপটে আমরা আমাদের দেশকেও বিশ্লেষণ করতে পারি। এখানকার জীবনযাত্রা, রাষ্ট্রীয় তথা সামগ্রিক জীবন যাত্রায় ধর্মীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ঐতিহ্য তার ধর্মের সাথে জড়িত।

মানুষের প্রাথমিক পরিচয়টা আসে ধর্মের থেকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের নামের আগে মুহম্মদ যুক্ত করা হয়ে থাকে। তার কারণ হলো ধর্মীয় প্রভাব। একই রীতি আমরা অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। অর্থাৎ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্ম অনুযায়ী তাদের পরিচয়টা নির্ধারণ করে থাকে। মানুষের প্রারম্ভিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে ধর্ম ব্যাপক প্রভাব রেখে থাকে। মুসলমানরা কাউকে দেখলে সালাম দিয়ে থাকে। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী অন্যকে সম্বোধন করে থাকে। এসবই মূলত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। সেই অর্থে বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রম কৃষিকে ঘিরেই আবর্তিত হওয়া উচিত বৈকি। বাংলার অধিকাংশ মানুষই কৃষক। ফলে তারাই বাংলার প্রাণ এবং সমাজের প্রধান চালিকা শক্তি। কৃষিকাজ করতে গেলে জমির প্রয়োজন হয় তাই আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় জমিকেও প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তবে আধুনিকতার ফলে এখনকার বাংলার সমাজপতিদের পেশাগত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মানুষ অতীতকাল থেকেই গণতন্ত্রমনা। অবশ্য বাঙালিদের অন্য একটি পরিচয় রয়েছে তা হলো বিদ্রোহ ভাবাপন্ন। কেননা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে এ জাতি খুব অল্প সময়ের জন্য অন্যের অধীন ছিল। যদিও সাময়িক সময়ের জন্য থাকত আবার পরক্ষণেই সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহ করে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করে ফেলত। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় এই অঞ্চল সব সময়ই স্বাধীন ছিল। এই অঞ্চলে যে আন্দোলনগুলো হয়েছে বিশেষ করে ফরায়েজী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, তেভাগা বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং সার্বিকভাবে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এই সকল অঞ্চলেই তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। তাছাড়া ভারতীয় মুসলিমদের রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে গঠিত মুসলীম লীগ ঢাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া দেশ বিভক্তির যে আন্দোলন ছিল সে আন্দোলনের সম্মুখ ভাগে ছিল বাংলার জনতা। তার পরবর্তীতে ১৯৪৮ এর উর্দু বিরোধী আন্দোলন থেকে ১৯৫২ এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ৬০ এর দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন, সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন সবই আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের নির্যাস। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও নব্য স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এদেশের মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার মূর্ত প্রতীক। আমাদের যে রাজনৈতিক মুক্তির দিক নির্দেশনা তা প্রদান করেছে আমাদের এই বাংলার সূর্য সন্তানরা। এসব মানব দরদী উদারপন্থী নেতৃবর্গের মাঝে রয়েছে শের-ই-বাংলা একে ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রমুখ।

আমাদের এই অঞ্চলে জনবসতি বেশ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। অতি প্রাচীন জনগোষ্ঠীর উর্বর আবাসভূমি হিসেবে আমাদের একটি সমৃদ্ধশীল ঐতিহাসিক ঐতিহ্য থাকাটাই স্বাভাবিক। অতীতকাল থেকে এই অঞ্চলে ধর্ম গোত্র ও বিভিন্ন বর্ণের মানুষের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এই অঞ্চলকে অনেকে ধর্মের মিলনক্ষেত্র হিসেবেও আখ্যায়িত করে থাকে। কেননা প্রাচীনকাল থেকে বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম লীলাক্ষেত্র আমাদের এই বাংলা। ফরাসী পরিব্রাজক বানিয়ার লিখেছেন, "পাশ্চাত্য দেশে সুজলা সুফলা হিসেবে মিসরকে চিহ্নিত করা হতো; কিন্তু সুজলা দেশ হলো বাংলাদেশ"।

ডঃ নূরুল ইসলাম তাঁর প্রবন্ধে বলেন, "বাংলাদেশ হলো সোনার বাংলা।" এখানে জীবনযাত্রা অত্যন্ত সস্তা ছিল। আশেপাশের দেশে বাংলাদেশ থেকে ধান, চাল রপ্তানি করা হতো। বাংলাদেশ থেকে গোলকুন্ডা, কর্ণাটক আরব, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য দেশে চিনি রপ্তানি করা হতো। মিষ্টান্নের বৈচিত্র্যের জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত ছিল। বাংলাদেশে এত প্রচুর পরিমাণে তুলা ও রেশমের কাপড় তৈরি হতো যে একে ভারতের কাপড়ের আড়ত বলা হতো। এখান থেকে ইউরোপ, জাপানসহ পৃথিবীর সর্বত্র কাপড় রপ্তানি করা হতো। আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও মহান ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছে।

বাংলাদেশের সামাজিক জীবনযাত্রাতেও স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পদচারণায় এই বাংলা একটি সহনশীল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যার ভিত্তি হল সকল বর্ণ ও ধর্মের অভূতপূর্ব সহ-অবস্থান। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ধর্মভীরুতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সমগ্র বাংলাজুড়ে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও উপসনালয়ের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মুসলমানদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ পরিবার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কেননা পরিবারই আমাদের প্রধান প্রতিষ্ঠান। মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া মূলত পরিবারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গ্রামীণ সালিশ ব্যবস্থা ও ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে বেশ জোরেসোরে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পরিবার ব্যবস্থা এখন বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। যার ফলে আমাদের মূল্যবোধও অনেকটা বিঘ্নিত হচ্ছে। সামাজিক উৎসবের মধ্যে ঈদ, পহেলা বৈশাখ, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রধান উৎসব হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অতিথিপরায়ণতা এদেশের মানুষের মজ্জাগত বিষয়। বিপদে অন্যের পাশে দাঁড়ানো অন্যতম সামাজিক মূল্যবোধ।

জাতীয়তাবাদ বাঙালি সত্ত্বাকে একীভূত করেছে। এই জাতীয়তাবাদে বলীয়ান হয়েই বাঙালিরা স্বাধীকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই জাতীয়তাবাদের কারণেই বাঙালি সব বাঁধা অতিক্রম করে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যেও জাতীয়তা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সত্যিকার অর্থে অন্যান্য জাতীয়তাবাদ থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। অর্থাৎ এ জাতির জাতীয়তাবাদেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

সামাজিক আলোচনায় মূলত বাংলাদেশ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপরেখাকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র রয়েছে। এসকল রাষ্ট্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যা কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ঐতিহ্য পরিলক্ষিত হয় তা একান্তই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা আবৃত।

Call for Green and Blue Skies

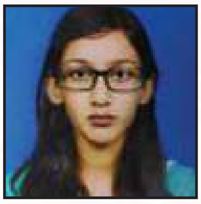

Zuyairia Moslemeen Khan
Deptartment of Economics, Session : 2015-16

We first got excited for batch trip when our seniors went on their batch trip in 2018. Looking at their photographs and videos we all got excited, and immediately started planning for our trip. So, you could say that we'd been planning for our batch trip for almost a year. With our shopping done, bags packed and everything checked, on February 10 on a windy night we finally set off for our long-cherished batch trip.

The enjoyment seemed to start as soon as the bus engine stared and the wheels smoothed over the asphalt. Little care for how late the hour was we turned on the music and sailed through the night dancing. The fun and dancing seemed to continue as we stopped for dinner in Cumilla. It was the first time the entire batch has sat down for a meal together, joking and laughing, and of course cameras being clicked.

Most of us got no sleep that night on the bus and we only rested once we reached our hotel in Bandarban. We woke up early the next day, it's funny how all the people that always complained about waking up early for class didn't seem to have any problem waking up at the earliest hour for the trip. After lunch we set of for site-seeing on the local Chander Gari. We first went to Shonar-Mondir, the largest Buddhist temple in Bangladesh. We watched in awe as the late afternoon sun shone on the brightly colored golden pillar and domes and the intricately sculpted statues.

Green trees and blue skies of Bandarban

After Shonar-Mondir, our next stop was Nilachol. The Chander Gari drove precariously over winding roads that seemed to take us higher and higher up the mountains. Nilachol was breathtaking. Being up high in the mountains, where all around us were blue skies and mountains. Living in a city of tangled electrical wire we needed a gush of fresh air. After dinner, sleep seemed like a distant requirement as we all gossiped at the night.

Mesmerizing view of Nilachol

Up in the clouds in Nilachol

The next morning, after breakfast we started for cox's bazar. The hours of impromptu bus dance parties commenced again. When we finally got into the water surrounded by those familiar faces, there was no happier feeling. We all splashed around and had water fights, seeing who could soak the other the quickest. We laughed and waded in the water. As night approached, we all flocked to the markets, but had to come back because we needed to get ready for our gala night. The gala night was fun, filled with food and friends. The night in cox's was one to remember; we all got together in one room and talked until it was past midnight. We sang songs, laughed and joked; it really felt like we were in the moment together.

On third day of the trip, we set sail for the Saint Martin's Island. Even the ship ride was fun. We fed the friendly seagulls and sang 'alow, alow' along with the newspaper seller on board. Once we reached the island, with its crystal-clear blue waters and rocky shores, we were mesmerized. Saint Martin's Island was a fantasy which took us away from our busy and hectic city lives.

A passing boat we saw en route to Saint Martin

Our resorts were amazing, and very close to the ocean. Some of us couldn't wait and immediately jumped into the water again. The clear azure water was irresistible. The next day we visited Chhera Dwip and happily munched on colorful golas and watermelons. The time in Chhera Dwip was short and fun, but we had to be back at Saint Martin. Both days on the island everyone was either submerged in the cool water or cycling on the beach.

Beautiful Saint Martin

At nights there, we went to the night market in Saint Martin. We happily munched on fresh fried fish and drank endless cups of tea. Dinners those nights were under the starry skies, surrounded by trees and sitting on hammocks. We also spent the nights talking till sunrise, with our faculties. It was amusing hearing about their student¬ life and their experiences in university. They also gave us wisdom regarding life and the many challenges we may face in the future.

Our chairman sir having fun riding a bicycle

Our faculty members enjoying the beach

The second day in Satin Martin was perhaps the most rewarding. We participated in a beach cleanup along with our respected faculties. Unfortunately littering is a big problem world-wide. People carelessly throw garbage on the beach and ruin the natural beauty of the island. The garbage soon goes into the sea and contaminates it, while also having a detrimental effect on the diverse marine life. And since we were on the island too, we also generated a lot of wastage and left a carbon footprint there. In order to compensate this, we felt like we should do something. We came together to collect as much garbage we could find and picked it up. The work did not feel hard but rather felt entertaining. It was good to know that we were having a positive impact on the environment. We felt as though we were giving back to the place that had given us such amazing memories.

Our happy and tired faces after the beach clean up

Beautiful blue Chhera Dwip

On last day of the trip, there was a general sense of gloom. We begrudgingly packed our bags and left so many memories. Though we played pillow passing and other games and that cheered us up a little. Our last few moments there, we spent longingly looking at the sea. Once in a while someone would quietly ask 'Do we really have to leave?' or shouted 'I don't want to go back'. We looked on, already feeling nostalgic about these past few days, and joked about ways we could stay back. Even the bus ride back was melancholic, we were too sad to have any more impromptu dance parties and too tired to sing at the top of our lungs. We just kept saying how great the trip was! The only words coming out of mouths were 'best batch trip ever'.

Sunset at Saint Martin

Friendly seagulls of Saint Martin

The effect that our batch trip had on us are long lasting. Saying that it was a trip of a lifetime would be an understatement. I'm sure none of us will forget about it anytime soon. The memories we made there are unforgettable and ever cherished. No matter how old, whenever we think back to those memories, they will bring a smile to our faces. And when we are old and don't get to see each other as often, we'll get together someday reminisce and say 'Ah! Those were the days'.

A Pathetic Soul

Azmir Hossain
Department of English, Session : 2017-18

I will suffer in one way or the other.
So, let me devote my soul to all the living souls on earth.
Let me devote myself with all that I have.
In return, let me get cursed by all the living souls on earth.

I will suffer in one way or the other.
So, let me listen to the sorrows that you have.
Let me listen to you with all that I have.
In return, let me get ignored by you at times when I need you to listen to me the most.

I will suffer in one way or the other
So, let me love you blindly let me love you with all that I have.
In return, let me get hated by you while only love can heal me.

I don’t want to die regretting,
Rather let me die committing.
Because in the end, anyway
I will suffer in one way or the other.

শিশুর সুন্দর জীবন গঠনে পারিবারিক সান্নিধ্য

তোফায়েল আহমেদ
শাখা কর্মকর্তা, ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন মার্কেটিং

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রচণ্ড দায় নিয়ে দিন শুরু হওয়া আর একরাশ ক্লান্তি নিয়ে দিন শেষ হওয়া এটাই জীবনের চরম বাস্তবতা। এই চরম বাস্তবতার চিত্রটি বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আরও চরম আকার ধারণ করছে। এই কঠিন বাস্তবতা কোমলমতি শিশু-কিশোরদের চরমভাবে বঞ্চিত করে মা-বাবার সান্নিধ্য ও ভালোবাসা থেকে। যার ফলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ হয় বাধাগ্রস্ত, তৈরি হয় নানান ধরনের পারিবারিক, সামাজিক এমনকি জটিল মানসিক সমস্যা। দু-একবার প্লান করেও অনেক মা-বাবা বেরিয়ে আসতে পারেননি এই কঠিন সমস্যা থেকে। সন্তানকে যথেষ্ট সময় দিতে না পারার অপরাধবোধে দিশেহারা থাকেন অনেক মা-বাবাই। তাই শাসন-আদর, চাওয়া-পাওয়া, আশা-নিরাশার সমন্বয়হীনতা যে সমস্যার সৃষ্টি করছে তা পরিবার, সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় সমস্যায় রূপ নিচ্ছে অনেক সময়। তরুণদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া, নেশায় আসক্ত হওয়া, সন্তানদের পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহার ও নৃশংসতা এর বেশির ভাগেরই উৎপত্তি পারিবারিক অসন্তোষ ও Disfunctioning থেকে। পিতা-মাতার সন্তানদেরকে সময়দান এ সমস্যার অনেকটাই লাঘব করতে পারে। কিন্তু এত কাজের ভিড়ে তা কি সত্যিই সম্ভব! ব্যস্ততার মাঝেও সন্তানদের কিভাবে একটু বেশি সময় দেয়া যায় তার কিছু কৌশলই আজকের আলোচ্য বিষয়-

রাতের খাওয়ায় একত্রিত হওয়া

আমাদের সারা দিন কাজ থাকলেও সন্ধ্যার পর কিন্তু অনেকেরই কাজ শেষ হয়ে যায়। দিনের কাজের তালিকায় পরিবারের সদস্যদের সাথে খাওয়ার বিষয়টিও তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। খাবার টেবিলে এক সাথে হলে পারিবারিক বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান এখানেই হতে পারে; যা পারিবারিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে। এছাড়াও এক সাথে খাওয়া পরিবারের সদস্যদের মধ্য সহজ সম্পর্কের উন্নয়ন ও পরস্পরকে বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর কোনো কারণে যখন আপনি দূরে থাকছেন পরিবারের লোকেরা আপনার অনুপস্থিতিকে উপলব্ধি করছে। পরিবারের সদস্যদের কাছে থেকে এ অনুভূতি সত্যিই উপভোগ্য।

পারিবারিক বিষয়ে সবাইকে চিন্তার সুযোগ দেয়া

পরিবারের একেবারে ছোট্ট ইস্যু থেকে বড় যেকোনো বিষয়ে সবাইকে যুক্ত করা, সবার কথার বলার স্পেস তৈরি করে দেওয়া, সবার মতামত শুনা ও মতামত শেয়ার করা, সবাইকে চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যেমন-বাড়ির কিচেন সিংকটা ভেঙে গেছে, কোন ঘরে কি রঙ দিতে হবে, বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কী করা যেতে পারে, বাগানে কী ধরনের ফুলের গাছ লাগানো যেতে পারে, বাড়ির ছাদকে কিভাবে ব্যবহার করব ইত্যাদি পারিবারিক কাজে সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পারিবারিক পরিবেশকে উন্নত ও টেকসই করে। পারিবারিক বিষয়ে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত সম্পৃক্ততা একদিকে যেমন পরিবারের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে তেমনি বৃদ্ধি পায় শ্রদ্ধাবোধ এবং সহযোগিতার উন্নত মানসিকতা।

কাজের ফাঁকে এসএমএস পাঠান

বাচ্চারা Surprise পছন্দ করে। সকালে যদি তাদের সাথে দেখা না হয়, তবে একটি ছোট পারিবারিক ভিডিও বা একটি ক্ষুদে বার্তা (SMS) পাঠানো যেতে পারে যার মাধ্যমে তারা আপনাকে খুঁজে নিতে চাইবে, আপনার অভাবকে অনুভব করবে। এখানে আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন তাদের মধ্যে আপনি উপস্থিত থাকতে না পেরে কষ্ট পাচ্ছেন।

সবাই মিলে বই পড়া

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে প্রতিটি পরিবারেই রয়েছে নানাবিধ ইলেকট্রনিক ডিভাইস। মোবাইল, ট্যাব, ল্যাপটপ, নোটবুক, কম্পিউটারসহ হরেক রকম আধুনিক সব উপকরণ; যেখানে ছোট বড় সকলের রয়েছে ইন্টারনেটভিত্তিক এক উন্মুক্ত জগৎ। এ জগতে বর্তমানে ছোট বড় সকলেই তাদের দিনের সিংহভাগ সময় ব্যয় করে থাকে। বই নিয়ে বসা কিংবা বই পড়ায় নিজেকে মত্ত রাখার মতো দৃশ্য এখন আর পরিবারে খুব কমই দেখা মিলে। তাই প্রতিদিন অন্তত আধা ঘণ্টা সময় সবাই মিলে বই পড়ে ব্যয় করা পরিবারের সাথে উত্তম সময় কাটানোর একটি অভিনব পন্থা। বই বাছাই, পড়া ও আলোচনা, Idea Share উন্নত Idology কে পরিবারে অভ্যস্ত করার বিশেষ পদ্ধতি।

বাচ্চাদের মাঝে মাঝে স্কুল বা ক্লাসে নিয়ে যাওয়া

বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া ও স্কুল থেকে নিয়ে আসার মাধ্যমে এদের সাথে অনেকটা সময় ব্যয় করার সুযোগ তৈরি হতে পারে। এর মাধ্যমে বাচ্চারা কেমন Peer Group এর সাথে মিশছে তারা আপনার বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর কি না সে সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারেন। বাচ্চারা সব সময় অতি মাত্রায় অনুকরণপ্রিয় ও সংবেদনশীল।

মাসে অন্তত একদিন সবাইকে নিয়ে ঘুরতে বের হওয়া

ঘুরতে কে না পছন্দ করে? ছোট শিশুদের কাছে ঘুরাঘুরি তো ভীষণ প্রিয়। তাই শত ব্যস্ততার মাঝে প্রতি মাসে এক একটি নতুন জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা রাখা যেতে পারে। এটি হতে পারে কোনো আত্মীয়ের বাড়ি, জাদুঘর, শিশুপার্ক, শিক্ষণীয় কোনো স্থান, ঐতিহাসিক কোনো স্থাপনা বা মজার কোনো জায়গা ইত্যাদি। এটা কোনো Theme Park বা Water Adventure Park ও হতে পারে। এই কাজগুলো করার জন্য বাচ্চাদের নিয়ে পরিকল্পনা (Plan) করুন ও নিয়মিত বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন।

পরিবারের সুখ-দুঃখের বিষয় নিয়ে গল্প করা

শিশুরা নতুনের প্রতি খুবই আগ্রহী। না জানা বিষয়গুলোর প্রতি তাদের আকর্ষণ প্রবল। তাই পারিবারিক ঐতিহ্য, ছবি ও ইতিহাসের সাথে পরিবারের লোকদের ও শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া সম্পর্ক উন্নয়ন ও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সহায়ক। এর জন্য ঘরে রাখা পুরান অ্যালবাম থেকে আগের দিনের ছবি বের করে বাচ্চাদের সাথে Share করা ও গল্প বলা, এটি তাদেরকে উজ্জীবিত করে। এর সাথে সম্প্রতি ঘুরতে যাওয়া ছবিগুলো পর্যায়ক্রমে যোগ হয়ে একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারা সংরক্ষিত হতে পারে।

পরিবারের ছোটদের সাথে গল্প করা

যদিও যান্ত্রিকতার যুগে শিশুদের যেখানে ন্যূনতম সময়টুকুন দেওয়া দুষ্কর; তথাপি পরিবারে ছোটদের সাথে গল্প করার সুযোগ নেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে এক সাথে বেড়াতে যাওয়া ভালো একটি সুযোগ হতে পারে। সবাই মিলে কার, বাস, ট্রেনে ভ্রমণ করলে নিরিবিলি অনেক কথা বলার ও শেয়ার করার সুযোগ হয়; যাতে পারিবারিক মূল্যবোধ লালন ও পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন হয়। সুতরাং কাছাকাছি হওয়ার এই কৌশলকে পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছোটদের সাথে মজার কিছু করা

ছোটরা সব সময় ভালো কিছু করতে চায়, নতুন কিছু করতে চায়। আর এই ভালো সহযোগিতা পেলে ছোটরা অনেক বেশি উৎসাহ বোধ করে। তারা নতুন উদ্যমে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়। মাঝে মাঝে ছোট শিশুকে উপাসনালয়ে নিয়ে যান, শিশুকে দিয়ে একজন ভিখারির হাতে খাবার, টাকা-পয়সা তুলে দিন, বাচ্চার মনে পরিবর্তন হবে। গরীব ও দুঃখীদের নানা বিষয় নিয়ে ছোটদের সাথে আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন। আর দেখবেন আপনার মনে তৃপ্তি ও প্রশান্তি আসবে। অনুভূতিগুলো অর্জনের চেষ্টা করুন।

বাচ্চাদের নিজ নিজ ধর্মীয় রীতিতে সম্বোধন করুন

আপনি যদি বাইরে থাকেন- তবে কম সময়ের জন্য হলেও এক বারের জন্য 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' কিংবা নিজ নিজ ধর্মীয় রীতিতে সম্বোধন করুন ও কাছে থাকতে চেষ্টা করুন। ছোট্ট এই কথাগুলো অনেক কঠিন বিষয়কেও সহজ করে দেয়।

ছোট্টদের দাদা-দাদী বা নানা-নানী কিংবা পরিবারের বয়স্কদের সাথে কথা বলান

আজকাল অনেকেই তার শিকড়ের সাথে ছোটদের পরিচয় করাতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান না। যারা শহুরে জীবনে বেড়ে উঠছে; তাদের ক্ষেত্রে এই চিত্র খুবই প্রকট। বড় কোনো উৎসব ছাড়া গ্রামীণ পরিবেশের সাথে এবং পরিবারের বয়স্কদের সাথে ছোটদের কদাচিৎ দেখা মিলে। তাই পরিবারের বয়স্কদের সাথে বাচ্চাদের সরাসরি কথা বলান বা মাঝে মাঝে ফোন ধরিয়ে দেয়া, যা আপনার বাচ্চাদের বড়দের সম্মান করতে শেখাবে। তাদের বাসায় বেড়াতে গেলে বড়দের (Senior) সাথে সাক্ষাৎকে Special করে দেখুন। এতে তাদের কাছে আপনারও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

সবাই মিলে নতুন কিছু শেখা

পরিবারের সবাই মিলে নতুন কোনো শখ বা নতুন কোন কাজ করুন। যেমন সবাই মিলে নতুন ভাষা শিখুন, নতুন কিছু Craft করতে শিখুন, গান শিখুন, কুরআন শিখুন, গাড়ি চালান ইত্যাদি শেখা যেতে পারে। কেউ শেখাল ও কেউ শিখল যা পারিবারিক সময় দান বাড়ায় ও পারিবারিক হৃদ্যতা তৈরি করে। প্রতিদিন কাজের মাঝে কিছু সময় আলাদা করে রাখুন, এই সময়গুলো পরিবারের সাথে উপভোগ করে কাটান বা নিজের সাথে কাটান। বন্ধু-বান্ধবসহ প্রিয়জনদের সাথে সময় দিন।

সবাই মিলে আড্ডা দেয়া

পরিবারের সবাই মিলে আড্ডা দিন। এখানে আলোচনা হবে প্রত্যেকটা দিন কে কিভাবে কাটাচ্ছে, কার কী সমস্যা, প্রত্যেকে নিজেদের সাথে সহজ ও সাধারণ বিষয় নিয়েও আলোচনা করতে পারে। প্রত্যেকেই যখন সবাই সবাইকে জানতে পারবে উপলব্ধি করুন জীবনটা এখন কত উপভোগ্য। উল্লেখ্য, পারিবারিক বেশিরভাগ সমস্যাই নিজেদের না জানা ও না বোঝার কারণে সৃষ্টি হয়।

খাবার ভাগ করে খান

সবাই মিলে এক টেবিলে খান অথবা কম খাবার সবাই মিলে Share করে খান অথবা সবার পছন্দের খাবার এক জায়গায় করে সবার খাবার সবাই মিলে খান, জীবনের অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাবে।

পারিবারিক বিশেষ দিনগুলোকে সবাই মিলে উদ্‌যাপন করুন

বছরে বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। এই উৎসবের দিনগুলোতে পরিবারের সবাই একত্রিত হওয়ার সুযোগ থাকে। বিভিন্ন উপলক্ষে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সাধ্যমতো উপহার দেয়া নেওয়ার মাধ্যমে পারিবারিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। এটা জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা করুন

ধর্ম মানুষকে সামাজিক করে, জীবনকে বুঝতে শেখায়, পরিবারের সবাই মিলে পালন করে সবাইকে কাছে নিয়ে আসে। ছোটদের শিশুবেলা থেকে নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া উচিত। এতে করে শিশুদের মাঝে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে এবং পরবর্তী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যায়ের সাথে আপসহীন মানসিকতার পরিস্ফূটন ঘটে। বড়দের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের স্নেহ করা, পরিবারের লোকদের মানসিক চাপ কমিয়ে প্রশান্তির পরিবেশ তৈরি করে।

পরিশেষে বলা যায়, বাস্তবতা যতই কঠিন হোক না কেন একটু আন্তরিকতা, একটু ভালোবাসা দেখান, একটু পরিবারের সাথে সময়দান অতৃপ্তির কঠিন দেয়ালকে ভেঙে উপভোগ্য জীবন এনে দিতে পারে। যে পরিবারের সুখের জন্য এত বেশি পরিশ্রম করেন, আর এই অতিরিক্ত পরিশ্রমই যদি আপনার পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়, তবে এই পরিশ্রমের কতটুকু প্রয়োজন আছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। তাই আসুন, সবাই মিলে পরিবারের সাথে বেশি বেশি সময় দিয়ে, সুন্দর জীবনের অনিবার্য দাবি পূরণের চেষ্টা করি, সুন্দরভাবে বাঁচতে শিখি।

Dust Bin Free Dhaka City Establishment of Circulatory Dust Van

Md. Rashedul Hasan Chowdhury
Department of Environmental Science
Session : 2017-18

Md. Rakib Hasan
Department of Environmental Science
Session : 2017-18

On a contemporary situation, Dhaka city is facing enormous environmental crises. Waste generation and management is one of the alarming issues. Due to technological advancement the quality of daily life is improving, however resource consumption is increasing day by day at an irregular rate. As a result, waste generation rate is growing as well in Dhaka city. Dhaka South City Corporation (DSCC) and Dhaka North City Corporation (DNCC) both has all the responsibilities to accumulate & governing the waste. Both city corporation and their associates collect domestic waste from house to house. The collected waste dumped into a road-side open stationary dust bin through small vehicles followed by informal separation, load in a truck and dispose to the landfills. In this conventional system, road-side dust bins create different types of negative impact on human health and surrounding environment like emitting bad odor, chance of exposure to the pathogenic contaminants which lead to be a severe public health issue. This situation is now going to be exacerbated and uncontrolled.

On this circumstance, an emerging "Circulatory Dust Van" can bring a smart solution to solve this problem.

A "Circulatory Dust Van" is a smart, dynamic and compacted van which has two chambers, one is for septic substances and another one is for non-septic substances. This van amasses waste from a specific zone in a certain periods of time by a circulatory dynamic way in the city. There will be some selected zone or transfer station where the van can collect the waste meticulously from the entitled small vehicles those collect waste from door to door. These small vehicles have portable cover like polythene; therefore waste will have less chance of exposure to the environment. Circulatory Dust Van has significant "Emergency sirens" as like ambulance that helps to commute faster from transfer station to the landfill or final disposal destination where the collected waste can convert into energy through microbial degradation.

The advantage of using this "Circulatory Dust Van" is no fixed dust bin will be needed on those particular zones as a result there will be no or less human health issues and surrounding environment will be neat and clean.

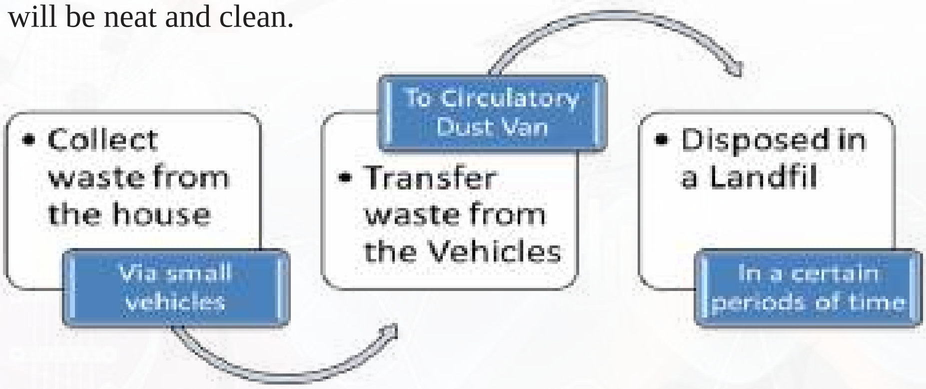

Fig: Flow chart establishment of Circulatory Dust Van

মরা নদী

মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ
সেকশন অফিসার
কাউন্সিলিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেন্টার

পথ পানে অপলক
আমি চেয়ে রই,
বন্ধুবীনে আর কতকাল
কাটবে বলো সই?
উজান গাঙ্গে কত ঢেউ;
ভাঙ্গে নিত্যদিন
আমার পদ্মা শুকায়ে
আজ হল যে বিলীন,
নদী তটে বসে আমি
ভেবে হই সারা,
কোন কালেগো ভাঙ্গবে আবার;
জোয়ার বাঁধন হারা!
জীবন বিনে স্রোতস্বতি
তিলে তিলে খুন,
ভরা যৌবনে তাহার
ধরছে আজ ঘুণ ।
বার্ধক্য ধরেছে তাহার
আপন অবহেলায়,
ধরেছে আজ ফাটল, তাহার;
জীবনের জয়োভেলায়,
নব যৌবন আসবে আবার
কবে, কখন বলো?
অনেকতো হল সময়
মাঝি; এইবার পাল তোল,
শুধায়েছি জোয়ান
হও বলবান,
সময়তো হল বেশ,
দুখের দিন গুনার পালা
এইবার হল বুঝি শেষ!

সুন্দর পথ

সাজিয়া রহমান
মাস্টার্স অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, শিক্ষাবর্ষ- ২০১৮-১৯

কালের ভিতরে সুখ আসে নানান উচ্ছ্বাসে মেতে
ভালোবাসার নদীতে একদিন চর জাগে
বাতাসের ভিতরে বাতাস আসে আপন হয়ে
পাখির গানে গানে জীবন জাগে সুবর্ণ দ্বীপে
অন্তরের সফলতা বাড়ছে ব্যাকুলতা ভুলে গিয়ে
অন্ধকারের ছায়ায় চলতে পারি সোনালি পথ দিয়ে ।

প্রতীক্ষার শেষেও উঠতে পারি উচ্চ পর্বতে
বনের ভিতরের নতুন পথে যেয়ে পেয়েছি ভালোবাসা
বৈচিত্রময় সাগর সৈকতে পেয়েছি নতুন আশা
জীবন বাস্তবতার কাছে যায়নি দূরের কোনো খোয়াবে
নিঃসঙ্গতার মাঝে খুঁজে পেয়েছি আলো ছায়া
গাছের পাতায় পাতায় দেখেছি অব্যক্ত মায়া ।

আকাশের মেঘে বৃষ্টি নামে উর্বরতা নিয়ে
স্বপ্নের বাগানে ফুল ফোটে অনেক আশায়
ফসলের মাঠ দেখে মন যায় রাঙিয়ে নিতে বারবার
বিল বাওড়ের মাছের সাঁতার দেখে মন জুড়ায়
নদীতীরের ঘর-বাড়িতে দেখি অঢেল মমতার ছোঁয়া
মনে হয় যেনো এটা ভালোবাসার পরম পাওয়া ।

স্রোতের নদী বয়ে চলে আপন সত্ত্বায়
মনের কথা বলতে পারি রোমান্টিকতা নিয়ে
সুখের স্বপ্নে রাতের শেষে ঘুম ভাঙ্গে
ভালোবাসার আহবানে জেগে দেখি সুন্দর পথ
ওই পথ দিয়ে হেঁটে যেতে চাই সফলতা নিয়ে
ভালোবাসায় ভরে উঠুক সকল মানুষে হৃদয়ে ।

Dengue and Recent Mosquito-borne Viral Fever Outbreak in Bangladesh : Concern, Causes and Control

Shazeed-Ul-Karim
Section Officer
Office of the Evaluation, Faculty & Curriculum Development (OEFCD)

Introduction

A fever which is occurred as a result of viral infection in a human body known as viral fever. In recent years Bangladesh is witnessing several viral fever outbreaks, among which mosquito-borne viral fever has become a great public health concern. The alarming number of Dengue and Chikungunya cases have been recorded in the capital, Dhaka as well as nationwide. Though the symptoms of viral fever are very common, this may turn to threatening complication which often leads to death. Viral illness does not respond to any antibiotic. Moreover, no vaccine and specific medicine are available to treat Dengue and Chikungunya infection. Precaution and appropriate control measures can curtail the risk of seasonal viral fever outbreak in Bangladesh.

Dengue Fever

Dengue fever is a mosquito-borne viral disease. The infective female Aedes aegypti mosquito is the vector for transmitting dengue virus to human through its bites after acquiring the virus while feeding on the blood of a diseased person[1].

Figure: Aedes mosquito. Source: The Daily Star

In Bangladesh, the first incidence of dengue infection was identified in 2000[2]. From then on, until 2018, more than half lakh people were suffered from dengue fever and among them nearly 300 people died[2]. The situation has become even worse this year (2019) and has broken all the previous record of dengue outbreak[2]. According to Directorate General of Health Service (DGHS), from beginning of January to third week of July in 2019, more than 6500 people were hospitalized due to dengue cases in various hospitals of Dhaka City[3]. Another study estimated almost 30000 patient who were hospitalized with dengue fever nationwide[4]. Surprisingly, July 2019 saw the highest number of dengue incidence in terms of month in the history of Bangladesh (Shown in tables) [5,6].

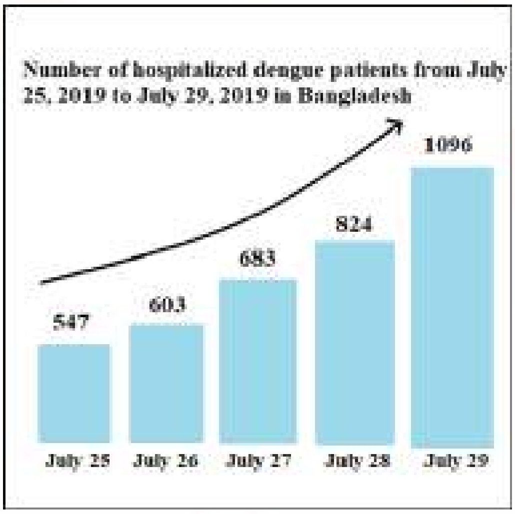

Source: The Financial Express, July 29, 2019

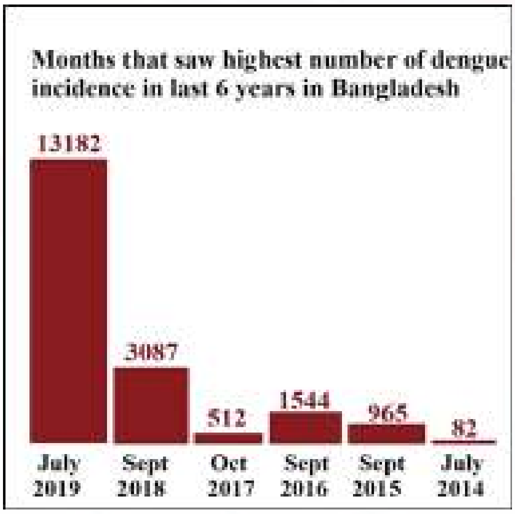

Source: The Daily Star, August 03, 2019

According to WHO the clinical symptoms may vary according to the age. Symptoms typically include high fever with headache, vomiting, nausea, muscle and joint pains, rash, swollen glands, pain behind the eyes. Currently, new features like loose motion, renal failure, and pneumonia have been identified in Bangladesh(3). Most importantly, secondary dengue infection sometimes creates hemorrhagic fever which often leads to death(7).

Chikungunya Fever

Chikungunya fever is also a mosquito-borne disease of human caused by chikungunya virus. Like dengue, Aedes aegypti mosquito is also the vector of chikungunya infection. Another vector of this illness is Aedes albopictus mosquito. These two species usually bite human throughout daylight hours(8). In Bangladesh the first outbreak of chikungunya fever is identified in Rajshahi and Chapianawabganj districts(9). The major outbreak of Chikungunya virus happened for the first time in the Capital of Bangladesh between May and September in 2017(10).

The symptoms are as common as dengue fever. Symptoms usually appear 3 to 7 days after infection. The most typical symptoms are fever and joint pain. Other symptoms include headache, rash, muscle pain, joint swelling. Though chikungunya infection is not as deadly as dengue infection, the symptoms can be severe to disabling(11). The most alarming is that fetus and newborn can be infected after maternal chikungunya infection during gestation(12).

Causes

The causes of dengue and chikungunya breeding are similar. An investigation led by the Disease Control Division of DGHS, exposed that densely populated Dhaka is now considered as preferred breeding ground for Aedes mosquitos. The possible breeding grounds for the carrier (mosquito) are places with stagnant water, flower tubs, discarded cup and mug, clay and paint pots, plastic or metal pack, discarded tires, uncovered water tanks and stagnant rainy water(3).

Control and Cure

To control dengue fever and chikungunya fever, the first obligatory step is to control the breeding of Aedes mosquitos. WHO recommends few practical control measures to minimize the breeding within the community of Bangladesh which are a) proper storage, collection and disposal of solid waste, b) cleaning of street, drainage and removing water bearing containers, c) destroying/

altering/ removing/ recycling of non-essential containers, d) well-maintaining of water-storage containers, e) hanging mosquito net over sleeping bed as well as installing on the every entrance of the house, and f) clothing which reduce skin contact to the day-biting mosquitos.
The successful actions of Kolkata City Corporation to control Dengue are also the exemplars for Bangladesh to control dengue and chikungunya incidence. Those successful approaches were a) arranging awareness campaign on the diseases, b) keeping Rapid Action Teams stand-by for destroying mosquito breeding, c) monitoring, and d) diagnosing infection and providing treatment(13).

Dengue infection can be deadly if it creates hemorrhagic fever and chikungunya fever often may be severe to adult and newborn. According to WHO there is no vaccine or medicine available to treat dengue and chikungunya infection. Treatment is focused primarily on relieving the symptoms. Infected patient should take proper rest, drink plenty of fluids, sponge the body with water, get doctor for painkilling medication, get tested for fever and pain.

Other mosquito-borne Viral Fever

Bangladesh has a past incidence of Zika virus infection. The vectors of this viral transmission are as similar as chikungunya fever, Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitos. Currently, in Bangladesh there is no evidence of ongoing Zika Virus outbreak(14).
Another mosquito borne viral fever is Yellow Fever. The causative vector of this infection is Aedes aegypti. This infection is not frequent like dengue or chikungunya. Most of the infected persons are asymptomatic or have mild symptoms with complete return to healthy state(15).

Conclusion

Though different mosquito-borne viral fevers are very common in Bangladesh, the recent outbreaks with numerous fatalities raising great concern to the public health. However, in case of any viral fever, people should not be panicked over symptoms. Infected or suspected patient should take proper rest, drink lots of fluid, and if pain and fever linger, one must visit doctor, take painkillers on doctor’s advice and undergo diagnostic tests.

References

1. World Health Organization. http://www.searo.who.int/bangladesh/dengue/en/.
2. The Daily Star, July 10, 2019. https://www.thedailystar.net/frontpage/dengue-fever-in-dhaka-cause-for-alarm-now-1769179.
3. Dhaka Tribune, July 22, 2019. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2019/07/22/is-dengue-turning-into-an-epidemic.
4. Firstpost, August 08, 2019. https://www.firstpost.com/world/dengue-outbreak-in-bangladesh-we-are-scared-say-residents-as-viral-fever-overwhelms-nation-23-dead-so-far-7133191.html.
5. The Daily Star, Aug 03, 2019.

https://www.thedailystar.net/country/dengue-fever-outbreak-1649-hospitalised-in-24-hours-1781182.
6. The Financial Express, July 29, 2019. https://thefinancialexpress.com.bd/national/dengue-spreads-to-50-districts-1564408195.
7. Suzuki K, Nakayama E, Satio A, et al. (2019). Evalution of novel rapid detection kits for dengue virus NS1 antigen in Dhaka, Bangladesh, in 2017. Virology journal.
8. World Health Organization. http://www.searo.who.int/bangladesh/aedescontrol/en/.
9. Hassan R, Rahman M, Moniruzzaman M, et al. (2014). Chikungunya- an emerging infection in Bangladesh: a case series. Journal of Medical Case Reports.
10. Hossain M S, Hasan M M, et al (2018). Chikungunya Outbreak (2017) in Bangladesh: Clinical profile, economic impact and quality of life during the acute phase of the diseases. Plos Neglected Tropical Diseases.
11. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/chikungunya/symptoms/index.html.
12. Despina C, Shoshana N, et al (2018). Mother-to-child transmission of Chikungunya Virus: A systematic review and meta-analysis. Plos Neglected Tropical Diseases.
13. The Daily Star, Aug 01, 2019. https://www.thedailystar.net/frontpage/kolkata-shows-the-way-to-control-dengue-in-india-1780021.
14. International Association for Medical Assistance to Travelers. Bangladesh General Health Risk: Zika Virus.
15. The Daily Star, July 30, 2017. https://www.thedailystar.net/health/health-tips/how-avoid-yellow-fever-1440709.

পথিক

প্রভাষক মোঃ নাছির উদ্দিন
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

আজি এ রজনীতে
চন্দ্র তারার মেলায়
একলা পথে রয়েছে পথিক
আড়ষ্ঠ এ বেলায়।
অমনিশার ভিতর পথিক
হাতড়ায় অলিগলি
কবে, কখন কোন বাগানে
ফুটবেগো সে কলি?
দিবস রজনী ফিরিয়া ক্লান্ত
আকাশ কুসুম কল্পে,
শৌর্যবীর্য ঢাকিয়া পড়িছে
ব্যর্থতা ভরে গল্পে।
রঙিন জীবন পার করিছে
লইয়াছে শত সুখ,
সুখের সাগরে ভাসিতে গিয়া
বরিয়া লইল দুখ।
কল্প তরুর ভিতর আজ
হারাইয়া ফেলি সব,
পথের ধারে বসিয়া পথিক
করিছে দুঃখের রব।
বিলাসিতায় মত্ত তাহার
জীবনের চারিদিক,
পথের ধারে একলা বসি
ভাবিছে সে পথিক।
পথে-প্রান্তরে চলিত যখন,
থাকিত শতজন,
দিত যে কত মন্ত্রণা
করিত সম্ভাষণ।
বসন্তের কোকিলেরা আজ
সব চলে গেছে ছাড়ি,
যে পথে একদা করিত দর্প
সে পথই যে আজ বাড়ি।
দর্পভরা জীবনকভূ
চায়না জগৎস্বামী,
দাম্ভিকতার মাঝেই থাকে
পরাজয়ের হাতছানি।

বাংলাদেশে আইনগত সহায়তা

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
ডিপার্টমেন্ট অব 'ল', শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-১৬

একটি দেশের সুশাসন সে দেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ও স্বচ্ছ জবাবদিহিতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কোনো বিচারব্যবস্থা স্বাধীন ও স্বচ্ছ হলে সেটি সহজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সচেতনতার অভাব ও আর্থ-সামাজিক সমস্যার কারণে আদালত পর্যন্তই দাবি নিয়ে পৌঁছতে পারেনা। অপরাধ করেও তাই অপরাধী থাকে বিচারব্যবস্থা ও জবাবদিহিতার বাইরে। সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা কমাতে অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির থেকে সেই অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি নিশ্চিত করা বেশি জরুরি। উন্নত দেশের বিচার ব্যবস্থা অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির পরিবর্তে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই সে সব দেশের মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারও এগিয়ে যাচ্ছে আপন গতিতে। ২০০৭ সালের স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিচার বিভাগকে স্বাধীন, স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল করতে সরকারের নানামুখি পদক্ষেপের মধ্যে নাগরিকদের আইনগত সহায়তা প্রদান অন্যতম।

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন অধিকার বঞ্চিত মানুষদের আইনগত সেবা নিশ্চিত করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ প্রণয়ন করেছে। এই আইনের আওতায় সরকার জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন আইনগত সহায়তাকেন্দ্র স্থাপন করেছে। জাতীয় পর্যায়ে-জাতীয় আইগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইন সহায়তা সেল, জেলা পর্যায়ে-জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি' এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটি। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে গঠন করা হয়েছে সুপ্রিমকোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, জেলা পর্যায়ে প্রত্যেক জেলা আদালত প্রাঙ্গণে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস গঠন করে একজন সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার বিচারককে লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

আইনগত সহায়তা কী? আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ অনুযায়ী আইনগত সহায়তা হলো-আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে ন্যায্য বিচার পেতে অসমর্থ ব্যক্তিকে কোন আদালতে দায়ের করা হয়েছে, দায়ের যোগ্য বা বিচার চলছে এমন মামলায় আইনি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান,
আইনজীবীর ফিস বা মামলার প্রাসঙ্গিক ফিস প্রদান,
নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীকে সম্মানী প্রদান।

সুপ্রিমকোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের প্রদত্ত সেবা সমূহ:

- আইনগত পরামর্শ প্রদান,
- মামলা দায়ের ও পরিচালনা,
- মামলা গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত,
- মামলার আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের প্রদত্ত সেবা সমূহ:

- আইনগত পরামর্শ প্রদান,
- মামলা করার পূর্বে পক্ষগণের আবেদনের ভিত্তিতে এবং মামলা চলাকালীন আদালতের রেফারের ভিত্তিতে আপোষ-মিমাংসার ব্যবস্থা করা,
- অসহায়, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদান,
- আইনগত পরামর্শ বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের প্রদত্ত সেবা সমূহ:

- আইনগত পরামর্শ প্রদান;
- অনুযোগ প্রণয়নে সহায়তা;
- মালিক ও শ্রমিক পরস্পরের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা;
- শ্রমিকের পক্ষে মামলা দায়ের করা এবং তা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ;
- শ্রমিকের পক্ষে শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনায় সহায়তা;
- আইনগত অধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করা ।

সরকারি খরচে প্রদত্ত আইনগত সেবা

বাংলাদেশ সরকার নাগরিকদের আইনি সেবা নিশ্চিত করতে কিছু বিষয়ে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে সুপ্রিমকোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি ও জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির মাধ্যমে আইনি সেবা দিয়ে থাকে ।

সুপ্রিমকোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস:

- দেওয়ানী আপীল,
- দেওয়ানী রিভিশন,
- ফৌজদারী আপীল,
- ফৌজদারী রিভিশন,
- জেল আপীল,
- রিট পিটিশন,
- লিভ টু আপীল ।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিস:

*** দেওয়ানি মামলা:**

- বিবাহ বিচ্ছেদ;
- ভরণপোষণ ও দেনমোহর আদায়;
- সন্তানের অভিভাবকত্ব;
- চুক্তি সংক্রান্ত মামলা;
- স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা;
- সম্পত্তি বন্টন ও বাটোয়ারা;
- সুনির্দিষ্ট কোর্ট ফি নির্ধারিত দেওয়ানি মামলা ইত্যাদি ।

*** ফৌজদারী মামলা:**

- শারীরিক নির্যাতন;
- এসিড নিক্ষেপ;
- যৌতুক দাবি ও এর জন্য নির্যাতন;
- স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর পুন-বিবাহ;
- অপহরণ;
- ধর্ষণ;
- পাচার ইত্যাদি ।

সরকারি আইনি সেবা পাওয়ার যোগ্যতা

অসহায়, দরিদ্র এবং যাদের নিজ খরচে মামলা পরিচালনার সামর্থ নাই তাদের জন্য সরকার নিজস্ব অর্থায়নে আইনি সেবা প্রণয়ন করে থাকে । আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী আবেদনের ভিত্তিতে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ সরকারি আইনি সেবা পাবেন-

- অসচ্ছল বা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি যার বার্ষিক আয় (গড়) ১৫০০০০ টাকা সুপ্রিমকোর্ট আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য আদালতের ক্ষেত্রে ১০০০০০ টাকার উর্ধ্বে নয়।
- কর্মে অক্ষম, আংশিক কর্মে অক্ষম, কর্মহীন কোনো ব্যক্তি।
- বার্ষিক ১৫০০০০ টাকার উর্ধ্বে আয় করতে অক্ষম কোনো মুক্তিযোদ্ধা এবং কোনো শ্রমিক যার বাৎসরিক গড় আয় ১০০০০০ টাকার উর্ধ্বে নয়;
- যে কোন শিশু;
- মানব পাচারের শিকার যে কোনো ব্যক্তি;
- শারীরিক, মানসিক যৌন নির্যাতনে শিকার যে কোনো নারী ও শিশু;
- নিরাশ্রয় ব্যক্তি বা ভবঘুরে;
- ক্ষুদ্রজাতি সত্ত্বা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি;
- পারিবারিক সহিংসতার শিকার বা সহিংসতার ঝুঁকিতে আছে এরূপ কোনো সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি;
- বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন এরকম কোনো ব্যক্তি;
- ভি জি ডি কার্ডধারী কোনো দুঃস্থ মাতা;
- দুর্বৃত্ত কর্তৃক এসিড দগ্ধ নারী বা শিশু;
- আদর্শ গ্রামে গৃহ বা ভূমি বরাদ্দপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;
- অসচ্ছল, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং দুঃস্থ মহিলা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি;
- আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আদালতে অধিকার প্রতিষ্ঠা বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অসমর্থ ব্যক্তি;
- বিনা বিচারে আটককৃত এমন কোন ব্যক্তি; যিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি;
- আদালত কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় ও অসচ্ছল বলে বিবেচিত ব্যক্তি;
- জেলা আদালত কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় ও অসচ্ছল সুপারিশকৃত বা বিবেচিত কোন ব্যক্তি।

সরকারি খরচে আইনগত সেবার জন্য আবেদন

- সুপ্রিমকোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির কাছে আবেদন করতে হবে।
- জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির নিকট আবেদন করতে হবে।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে অবস্থিত শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের কার্যালয় থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ করে শ্রম আদালত বিশেষ কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্যপ্রযুক্তির কোন বিকল্প নাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে বাংলাদেশের অসহায়, দরিদ্র, অধিকার বঞ্চিত মানুষের জীবনে লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। সরকারি আইনি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হচ্ছে প্রযুক্তি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে সরকারি আইনগত সহায়তার জন্য জাতীয় হেল্প লাইন কল সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করেন। এখন থেকে ১৬৪৩০ নম্বরে টোল ফ্রিতে কল করে জানতে পারা যাবে আইনি পরামর্শ, আইনগত তথ্য, কাউন্সিলিং, মামলার প্রাথমিক তথ্যসহ নানা বিষয়।

আইনের ছাত্র হিসাবে আমাদের উচিত সরকারের এসব মহান উদ্যোগগুলোকে স্বাগত জানিয়ে জনসচেতনতায় অংশগ্রহণ করা। অসহায়, অসচ্ছল, সুবিধা বঞ্চিত মানুষ যাতে ন্যায্য বিচার পায় এজন্য তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সমাজে আমাদেরকেই একথা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে-

আইন পেশা কোন ব্যবসা নয়,
আইন পেশা হচ্ছে মানবসেবা।

আলোকচিত্রে বিইউপি

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন
বিইউপির উপাচার্য

বিইউপির ১১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কেক কাটার সময় উপস্থিত
উপাচার্যসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের একাংশ

বিইউপির ১১তম প্রতিষ্ঠা দিবসে নৃত্য পরিবেশন
করছেন শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিইউপি উন্নয়ন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) এর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ
সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ, বিএসপি, বিজিবিএম,
পিবিজিএম, বিজিবিএমএস, পিএসসি, জি

Opening Convocation and Freshers' Reception-2019
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিইউপি উপাচার্য

Higher Education Policy in Bangladesh শীর্ষক সেমিনারে
উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথির সাথে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন বিইউপি মাননীয় উপাচার্যসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) and the Future of Disaster Management in Bangladesh শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ড. সালেমুল হক

Future Leaders' Summit অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সাথে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

CreADive-2018 এ প্রধান অতিথি মাননীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বার এর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন বিইউপির উপ-উপাচার্য

Bangladesh Capital Market Challenges and Art of Investment for the Beginners শীর্ষক সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে স্মৃতিচারণ করছেন বিইউপির শিক্ষার্থীবৃন্দ

Tagore's Orientalism: A Reflection শীর্ষক সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ

Mooting and Memorial Writing শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

Free Book Sharing Corner এর উদ্বোধন করছেন বিইউপির উপাচার্য

বিইউপিতে BUP Law and Moot Court Club এর উদ্বোধনকালে উপস্থিতির একাংশ

INTRAMUN এর সভাপতির হাতে সম্মাননা পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি

Readiness of Bangladesh in Becoming Developed Country by 2041: Business Perspective শীর্ষক সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ

Online Privacy and Protection of Personal Data for a Secured Cyberspace: Global Responses and Lessons for Bangladesh শীর্ষক সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপির হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন বিইউপি উপাচার্য

Human Empowerment and Attaining Sustainable Development Goals in Bangladesh: The Cases of Women and Marginal Community শীর্ষক ওয়ার্কশপে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদ এর মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপিসহ বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

আন্তঃবিভাগ ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০১৯ এ বালিকা ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন বিইউপির উপাচার্য

আন্তঃবিভাগ ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০১৯ এ বালক ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন বিইউপির উপাচার্য

বিইউপি আন্তঃবিভাগ ফুটবল-২০১৯ প্রতিযোগিতার অংশবিশেষ

বিইউপি আন্তঃবিভাগ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা ২০১৯ এ নারী বিজয়ী দলের সঙ্গে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

বিইউপিতে আন্তঃবিভাগ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা ২০১৯ এ পুরুষ বিজয়ী দলের সাথে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

বিইউপি আন্তঃবিভাগীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা-২০১৯ এ চ্যাম্পিয়ন দলের সাথে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

বিইউপি Lead IT-2019 অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করছেন বিইউপি শিক্ষার্থী

Econ Master প্রোগ্রামে বক্তৃতা দিচ্ছেন বিইউপি শিক্ষার্থী

বিবিএ ১৯ ব্যাচের ক্লাসে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বক্তব্য রাখছেন টেন মিনিট্‌স স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আইমান সাদিক

শ্রেণিকক্ষ কর্মশালায় Drug Abuse & Prevention শীর্ষক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ডেপুটি মেডিকেল অফিসার ডা. আজিজুন্নাহার এমবিবিএস, পিজিটি, ডিএমইউ

আন্তঃবিভাগীয় BUPDC Conquest ৪.০০ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বাংলা এবং ইংরেজি বিতর্কে বিজয়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ

bizMaestros-2019 এ চ্যাম্পিয়ন বিইউপির শিক্ষার্থীবৃন্দ

টেক্সাসে অনুষ্ঠিত Values and Ventures Competition 2019 এ সাফল্য অর্জনকারী বিইউপি শিক্ষার্থীবৃন্দ

Annual Australasian Debating Championship-এ অংশগ্রহণকারী অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এবং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'The Next Big Thing' শীর্ষক প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকারী বিইউপির "Powerpuff Girls" দলের সদস্যবৃন্দ

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের Social Service Club কর্তৃক আয়োজিত Socio Camp IX প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকারী বিইউপির শিক্ষার্থীবৃন্দ

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত OPTIMITY-2018 শীর্ষক প্রতিযোগীতায় চ্যাম্পিয়ন বিইউপির শিক্ষার্থীবৃন্দ

সুইজারল্যান্ডের জুরিখ-এ অনুষ্ঠিত Carbon Footprint Challenge 2018 শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বিইউপির শিক্ষার্থীবৃন্দ

Resume, Cover Letter and interview Skills শীর্ষক কর্মশালায় অতিথির হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ কর্তৃক IEEE Day উপলক্ষে আয়োজিত Poster Presentation প্রতিযোগিতায় বিইউপির বিজয়ী শিক্ষার্থীরা

BUP Finance Society কর্তৃক আয়োজিত Capitalizer '19 এ অংশগ্রহণকারী বিইউপির শিক্ষার্থীসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

Inter-University Policy Making Competition (POMAC 1.0)-2019' এ প্রধান অতিথির নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিইউপির শিক্ষার্থীরা

BUP Career and Education Fest-2019 অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণীর একাংশ

Career Steps: How to Design A Professional CV and Win in Interview শীর্ষক কর্মশালায় Mr. Kazi Rakibuddin Ahmed, General Manager (KAFCO) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন বিইউপি শিক্ষার্থী

BAASANA কর্তৃক আয়োজিত নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ১১তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিইউপির শিক্ষার্থী কর্তৃক Conference Chair's Award হওয়ার গৌরব অর্জন করেন

"BUP Folk Fest-2019" অনুষ্ঠানে দলীয় সংগীত পরিবেশন করছেন বিইউপির শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিইউপি ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বার্ষিক বনভোজন ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অংশ বিশেষ

বসন্তবরণ ১৪২৫ অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন বিইউপির শিক্ষার্থীবৃন্দ

বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উপলক্ষে নৃত্য পরিবেশন করছেন বিইউপি শিক্ষার্থীবৃন্দ

বর্ষা উৎসব ১৪২৬ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ

ডিএইচএসএম-২০১৫ ব্যাচের শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীগণ

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জাতীয় বন পরিদর্শনের একাংশ

এআইএস-২০১৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সেন্টমার্টিনে বিইউপি উপাচার্য

বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) পরিদর্শন করেন বিবিএ-১৮ এবং এমবিএ-১৮ ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দ

IDLC Finance Ltd. Motijheel, Dhaka পরিদর্শন করছেন ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিবিএ-জেনারেল প্রোগ্রামের এমবিএ-২০১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বান্দরবান ও কক্সবাজারে শিক্ষা সফরের অংশ বিশেষ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) পরিদর্শন শেষে ফটোসেশনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০১৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিবিএ জেনারেল এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রবি আজিয়াটা লিঃ পরিদর্শন

আইন বিভাগের ১ম বর্ষ/৪র্থ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালত পরিদর্শন

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের BES-2019 ব্যাচের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে "বোটানিক্যাল গার্ডেন" পরিদর্শন করেন

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের BES-2018 ব্যাচের একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন

Economics 2016 ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বান্দরবান, সেন্টমার্টিন, কক্সবাজারে শিক্ষা সফরের একাংশ

বিইউপিতে Environment Fest-2019 এর বিভিন্ন প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

BUP Techsurgence 2019 এ রোবো সকার কনটেস্ট পরিদর্শন করেন মাননীয় মন্ত্রী

BUP Techsurgence-2019 প্রতিযোগিতায় স্টল পরিদর্শন করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

আন্তঃ বিইউপি ফটোগ্রাফিক এক্সিবিশন Sfuron 2.0 পরিদর্শন করছেন বিইউপি উপ-উপাচার্য

বিইউপির মিডিয়া ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য

Post-Budget Analysis -2019 শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের সাথে আমন্ত্রিত অতিথি ও বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

১১তম বার্ষিক সিনেট সভায় বক্তব্য রাখছেন বিইউপির মাননীয় উপাচার্য

Land Survey-2019 শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

৪৪তম জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন বিইউপির শিক্ষার্থী

৪৪তম জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিইউপির শিক্ষার্থীবৃন্দ

বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে চারা রোপন করছেন বিইউপির উপাচার্য

Journey to Corporate: In the Context of Bangladesh শীর্ষক সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

BUP National Law Fest-2019 এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

ফিল্ম ফেস্ট-২০১৯ এর সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন মাননীয় রেলমন্ত্রী

বিইউপি ইন্টারন্যাশনাল মডেল ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স-২০১৯ অনুষ্ঠানে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা প্রধান অতিথির নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন

BUP National Law Fest-2019 এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

BUP Floating Bridge এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একাংশ

বিইউপিতে ডেঙ্গু নিধন-২০১৯ কর্মসূচির একাংশ

“BUP 2nd National Quiz Festival” এ অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

অগ্নিনির্বাপণ মহড়ায় উদ্ধারকারী দলের একাংশ

রবি আজিয়াটা লিঃ এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত

বিইউপি ডিবেট ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত BUP Debate Competition (BUP IV 2019) এর চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারীসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

2019-20 শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশের অংশবিশেষ

2019-20 শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরিক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন মাননীয় উপাচার্য

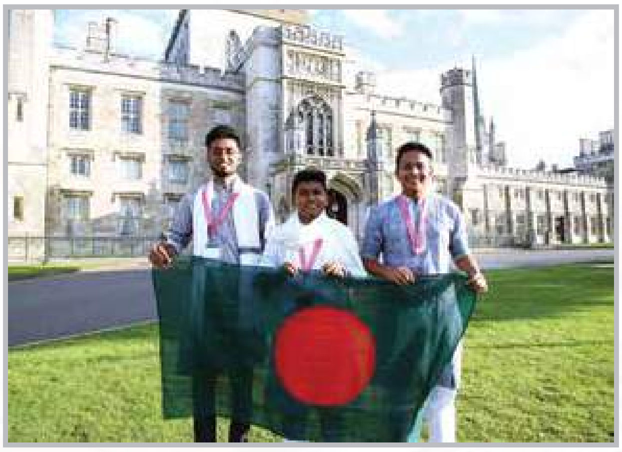

যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত শিক্ষার্থীদের জন্য নোবেল প্রাইজ নামে খ্যাত ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ক প্রতিযোগিতা "হাল্ট প্রাইজ" এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জনকারী বিইউপি শিক্ষার্থী

BUP এবং Macquarie University এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ

Western Sydney University, Australia এবং BUP এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এবং ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড এর চুক্তি স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ

Cadence

ANNUAL MAGAZINE

ANNUAL MAGAZINE 2019

BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS

BUP

EXCELLENCE THROUGH KNOWLEDGE

Bangladesh University of Professionals (BUP)

Mirpur Cantonment, Dhaka- 1216

www.bup.edu.bd